কুহকের দেশে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কুহকের দেশে

তু'বছর আগে হঠাৎ তিনটি বড় বড় রাজ্যের ওপর যুদ্ধের মেঘ কালো হয়ে জমে উঠেছিল। রাজ্যগুলি ছোট খাট নয় এবং তাদের মধ্যে একটি আবার সম্রাজ্য। যে কোন মুহূর্ত্তে তখন মনে হয়েছিল এই তিনটি রাজ্য পরস্পরের 'বিরুদ্ধে অভিযান করতে পারে।

এই সংগ্রামের কেন্দ্র হল একেবারে সুদূর প্রাচ্যে। কিন্তু এর সূত্রপাত কি থেকে, শুনলে বিশ্বাস করতে পারবে না। এর সূত্রপাত—সাধারণ একটি বাজারে,—মধু রাখবার একটি বাঁশের চোঙায়।

মিচিনার বাজারে বাঁশের চোঙা করে এক জংলী কাচীন এসেছিল পাহাড়ী মধু বিক্রী করতে। সেই মধুর ভেতর ছিল একটি পোকা। সেই পোকা থেকেই তিনটি রাজ্যের ভেতর রেষারেষির সূত্রপাত।

এমন আজগুবি কথা কেউ সহজে বিশ্বাস করতে পারবে না জানি, সমস্ত গল্প না বললে এর রহস্য এক কথায় ব্যাখ্যা করাও যাবে না। সেই জন্যেই এই কাহিনীর অবতারণা।

মিচিনা যে ব্রহ্ম দেশের উত্তরে ইরাবতীর ধারে একটি শহর, একথা অনেকেরই বোধ হয় জানা আছে। রেঙ্গুন থেকে সাত'শ

মাইল রেলপথ পার হয়ে এখানে পৌঁছোতে হয়। রেলপথ এইখানেই শেষ। তারপর ঘন জঙ্গল আর পাহাড়ের দেশ। সে দেশের কথা সভ্য মানুষ খুব কমই জানে।

এত দেশ থাকতে এই মিচিনায় কেন যে আমার মামাবাবু চাকরী নিয়ে এসে বসেছিলেন, তা তাঁর অন্যান্য অনেক ব্যাপারের মতই বোঝা কঠিন। মামাবাবু দেখতে নাহুস্-নুহুস্ নিরীহ চেহারার লোক। কথায় বার্তায়, আচারে ব্যবহারে কোথাও তাঁর এমন কোন লক্ষণ নেই যার দ্বারা মনে হতে পারে যে তিনি অসাধারণ কিছু করতে পারেন। চেহারা ও প্রকৃতির দিক দিয়ে মনে হয় যে সাধারণ কলেজের প্রফেসর বা অফিসের বড়বাবু হলেই বুঝি তাঁকে মানাত। ছেলেবেলা তাঁর সম্বন্ধে সেই রকম আশাই সবাই করেছিল। পড়াশুনায় তিনি ভাল। সবাই ভেবেছিল বড় হয়ে একটা আরামের কাজই তিনি বেছে নেবেন। কিন্তু তার বদলে সবাইকে অবাক করে মামাবাবু গেলেন মাইনিং পড়তে। মাইনিং সসম্মানে পাশ করে এসে দেশে চাকরী পাবার সুবিধে থাকতেও তিনি গেলেন সুদূর বর্মার জঙ্গলে প্রসপেক্টর হয়ে। তাঁর চেহারা বিলেত ঘুরে এসেও তেমনি অয়েসী নাহুস-নুহুস ভদ্রলোকের মত ছিল তখন। সবাই মানা করে বলেছিল যে, ও কাজের কষ্ট ও পরিশ্রম তাঁর সইবে না। সইল কিনা বলা যায় না, কিন্তু মামাবাবু ত দেশে আর ফেরেন নি। মিচিনায় তাঁর হেড কোয়ার্টার; সেখান থেকেই তিনি কিছুদিন আগে আমায় বেড়াতে

আসার জন্যে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন। কোন কাজ সম্প্রতি ছিল না বলে অমিও রাজী হয়ে গেছলাম। রেঙ্গুনের জাহাজে যেদিন উঠেছিলাম সেদিন কে জানত আমার ভ্রমণ মিচিনাতেই সাঙ্গ হবে না;—ভাগ্য আমার জন্যে এমন রহস্যময়, এমন ভয়ঙ্কর ভ্রমণকাহিনী নির্দ্ধারিত করে রেখেছে, যা খুব কম লোকের জীবনেই ঘটে।

মিচিনায় মামাবাবুর বাড়ীতে এসে প্রথমেই সেটা বাড়ী না যাদুঘর বুঝতে পারলাম না। মামাবাবু শুধু খনিজ বিদ্যাতেই তন্ময় নয়, আরও অনেক কিছু নিয়ে তিনি মাথা ঘামান। উত্তর ব্রহ্মের—পাথরের মূর্ত্তি, কাঠের কাজ থেকে সেখানকার নানা জন্তু, জানোয়ার, কীট পতঙ্গ সব কিছুরই নমুনা তিনি বাড়িতে সংগ্রহ করে রেখেছেন। দিনরাত সেই সব নিয়েই তিনি মেতে থাকেন।

মাথায় সামান্য একটু টাক পড়া ছাড়া মামাবাবুর চেহারার কিন্তু কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নি। প্রকৃতিরও নয়। তাঁকে দেখলে সবারই মনে বুঝি একটু আগলাবার প্রবৃত্তি হয়—অসহায় ছেলেমানুষকে যেমন করে আগলাতে হয় তেমনি। তাঁর সঙ্গে এক বছর কাটিয়ে ভালো করে পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও এখনো আমার মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়।

মিচিনায় গিয়ে প্রথম কয়েকদিন বেশ শান্ত ভাবেই কাটল। মামাবাবুকে দেখে মনে হল, যৌবনে যাই থাকুন, বয়স হবার

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বেশ শান্ত হয়ে গেছেন। পড়াশুনা নিয়েই মেতে থাকেন, অন্য দিকে বেশী নড়বার চড়বার আর উৎসাহ নেই। আর উৎসাহ থক্‌বেই বা কোথা থেকে। অভ্যেস অনেকগুলি তিনি খুব খারাপ করে ফেলেছেন—প্রায় নিষ্কর্ম্মা বাঙ্গালী জমিদারের মতই। ত্বপুর বেলা খেয়ে দেয়ে তোফা একটি ঘুম না দিলে তাঁর চলে না, রাত্রে রোজ আধঘণ্টা চাকরকে দিয়ে ভাল করে পা টেপান তাঁর চাই। এ ছাড়া খাওয়া দাওয়ার বাবুয়ানির ত কথাই নেই। এ রকম লোক কি আর নড়তে চড়ত পাবে বেশী! বুঝলাম, ছেলে বেলা তাঁকে যারা আয়েশী ভেবেছিল, তারা নেহাৎ ভুল করেনি। দিন কতক একটু জ্বলে উঠেই তিনি আবার নিভে গেছেন। তিনি যে বাংলা দেশে ফেরেন নি, তার কারণ বোধ হয় এই, যে, এক জায়গা ছেড়ে আর কোথাও যাওয়ার পরিশ্রম ও হ্যাঙ্গামটুকুও তিনি আর পোহাতে রাজী নন।

মামাবাবুর আশ্রয়ে তুবেলা রাজভোগ খেয়ে ও নতুন দেশে একটু আধটু বেড়িয়ে বেশ দিন কাটছিল। ওজনে যেভাবে বাড়তে স্থুরু করেছিলাম তাতে নিজেরই ভয় হচ্ছিল এমন সময়—

এমন সময় কিছুই নয়, মিচিনার বাজারে এক জংলী কাচীন [illegible] মধু বেচতে। সেই মধু বাঁশের চোঙা সমেত কিনে আনলে আমাদের চাকর মঙপো। এবং সেই মধু বিকেল বেলা প্লেটে

করে চাকৃতে গিয়ে মামাবাবু হঠাৎ চমকে প্রায় লাফ দিয়ে উঠলেন।

আমি পাশেই বশে চা খাচ্ছিলাম, অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "হল কি মামাবাবু?"

"শিগ্‌গীর আমার ম্যাগ্নিফাইং গ্ল্যাশটা আন দেখি।" বলে মামাবাবু প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

ম্যাগ্নিফাইং গ্ল্যাশ এনে মামাবাবুর হাতে দেবার সময় ব্যাপারটা কি বুঝ্‌তে পারলাম। প্লেটে মধুর ভেতর একটি পোকা, বোধ হয় মৌমাছিই হবে। সেইটে দেখেই মামাবাবুর এত উত্তেজনা।

মামাবাবু তখন কাঁচটা পোকাটির ওপর ধরে নিবিষ্ট মনে কি দেখতে আরম্ভ করছেন। একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম "নতুন রকম মৌমাছি নাকি?"

মামাবাবু মাথা তুলে আমার দিকে অদ্ভূত ভাবে তাকিয়ে উত্তেজিত ভাবে বল্লেন,—"নতুন? নতুন কি—একেবারে অদ্ভূত! এর হূল আলাদা—এর"···এইবার মামাবাবু গড়গড় করে নামতার মত এমন সব বৈজ্ঞানিক গোটাকতক নাম বলে গেলেন যার এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। সামান্য একটা মৌমাছি নিয়ে এতটা উৎসাহও আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাঁর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল সামনের প্লেটে একটা সামান্য পোকার বদলে বুঝি সাত রাজার

ধন মাণিক পাওয়া গেছে। মামাবাবু তাঁর বক্তৃতা শেষ করেই ডাক দিলেন—"মঙপো" !

মঙপো আমাদের মগ চাকর, মামাবাবুর সঙ্গে বহুকাল বাস করার দরুণ বাঙ্গালা কিন্তু সে বেশ বোঝে। মঙপো এসে দাঁড়াবামাত্র মামাবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মধু সে কার কাছ থেকে কিনেছে। মধু খারাপ ভেবে মঙপো তখন নিজের ওকালতি সুরু করে দিলে—মধু সে খুব ভাল জায়গা থেকেই কিনেছে। আসল পাহাড়ি মধু। সে আর মধু চেনে না···ইত্যাদি।

মামাবাবু তাকে বক্তৃতার মাঝে থামিয়ে দিয়ে বল্লেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, মধু তুই খুব চিনিস্। যার কাছে কিনেছিস্ তাকে নিয়ে আসতে পারিস এখানে ?"

মধুওয়ালাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে শুনে মঙপো ত প্রথমটা অবাক। তারপর অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে সে বল্লে, যে মধুওয়ালা একজন পাহাড়ী কাচীন, সকালে এসেছিল বাজারে, তাকে কোথায় পাওয়া যাবে আর।"

"খুব পাওয়া যাবে। তুই খোঁজ গিয়ে দেখি।" বলে মামাবাবু তাকে ধমকে পাঠিয়ে দিলেন, তারপর আমার দিকে ফিরে বল্লেন, যে পাহাড়ীরা অমন দুশ তিনশ মাইল দূর থেকে জংলী জানোয়ারের ছাল, জংলী চাকের মধু প্রভৃতি নিয়ে সহরে আসে। সহরে তারা একদিন থেকেই কখন চলে যেতে পারে না।

আমি বল্লাম—“কিন্তু মধুওয়ালাকে খুঁজছই বা কেন ?”

“বাঃ খুঁজবনা !” শান্ত শিষ্ট মামাবাবুর হঠাৎ গলার স্বরও গেছে বদলে,—“এ রকম মৌমাছির চাক কোথায় হয় জানতে হবে না ?”

“তা হবে বটে !” বলে একটু হেসে আমি তখন বেরিয়ে গেলাম।

মধুর ও নতুন রকমের মৌমাছির কথা আমি একরকম ভুলেই গেছলাম। সমস্তদিন মামাবাবুর সঙ্গে দেখাও হয়নি। রাতে এক সঙ্গে খেতে বসে হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম—“মধুওয়ালাকে পাওয়া গেল ?”

মামাবাবু অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন ভাবছিলেন। আমার কথায় সচেতন হয়ে একবার শুধু বললেন—“হুঁ।” তারপর আবার নিজের ভাবনায় যেন ডুবে গেলেন।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম—“কোথাকার মৌমাছি জানা গেল ?”

মামাবাবু কিন্তু সে কথার জবাব না দিয়ে নিজের মনেই অনেকটা বল্লেন,—“জানা ত গেছে, কিন্তু সেখানে যেতে পারলে খুব ভালো হয়। কে জানে আরো কত নতুন স্পিসিজ্ এমন কি জেনাস্ সেখানে পাওয়া যেতে পারে। এদিকের পোকা মাকড় সম্বন্ধে ভাল করে গবেষণা এখনো হয়নি। সত্যিকারের এন্টোমোলজিক্যাল এক্সপিডিশন্ হয়নি একটাও।”

বলতে বলতে মামাবাবু আবার উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। বল্লাম,—"তা হলে চলুন না যাই!"

"তাই ত ভাবছি!"

একটু কৌতুক করেই জিজ্ঞাসা করলাম—"জায়গাটা কোথায়? কত দূর হবে?" কিন্তু পরমুহূর্ত্তে মামাবাবুর উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

মামাবাবু বল্লেন—"বর্ম্মার সীমান্ত পার হয়ে যেতে হবে হিমালয়ের ধারে, পাহাড় আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শ চারেক মাইল।"

একটু হেসে আমায় যেন খুশী করবার জন্যেই মামাবাবু আবার বল্লেন, "ফিরতে পারলে একটা কীর্ত্তি থাকবে। এ অঞ্চল সত্যি মানুষের একেবারে অজানা। এখনও পর্য্যন্ত কেউ সে দেশে যায়নি, অন্ততঃ গিয়ে ফেরেনি!"

তারপর ক'দিন ধরে মামাবাবুর কাছে সে অদ্ভূত দেশের কথা একটু একটু করে শুনলাম। চীন, বর্ম্মা, ও তিব্বতের সীমান্ত সেখানে এসে মিলেছে। সেটাকে বলা হয় 'অজানা ত্রিভুজ'। এই অজনা ত্রিভুজাকৃতি দেশ ইরাবতীর একটি প্রধান শাখার উৎপত্তিস্থল। সে উৎপত্তিস্থল এখনও কেউ দেখেনি। সে দেশের পাহাড় জঙ্গল, জানোয়ার, মানুষ সম্বন্ধেও দুএকটা গুজব ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। সে দেশে যাবার পথকে দুর্গম বল্লে কিছুই বলা হয় না। যে কাচীন

পাহাড়ীদের কাছে সেখানকার খবর পাওয়া যায় তারাও নিজেরা খুব কমই সেখানে যায়। সেখানে ডারু বলে বামনাকৃতি একরকম জাত আছে, তাদেরই ছুটো ছাটা দু একটা শিকারী কাচীনদের কাছে কখন কখন এসে পাহাড়ী মধু, জানোয়ারের ছাল প্রভৃতি বিক্রী করে। আমাদের মধুওয়ালা এই ভাবেই তার মধু পেয়েছিল !

এ সব বিবরণ শুনে মনে মনে কিন্তু আমি একটু আশ্বস্তই হলাম। দুপুর বেলা যে লোকের ঘণ্টা দুই আরামে ঘুম না দিলে চলে না, সে লোক যে এসব দেশে অভিযান করবে না এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

কিন্তু অসম্ভবই একদিন ঘটে গেল। ক'দিন ধরে দেখছিলাম, আমাদের বাড়ীতে চীনে মজুররা যাতায়াত করছে। বাড়ীতেও ছোট ছোট ক্যাম্বিসের তাঁবু, প্যাকিং কেশ, প্রভৃতি নানা সরঞ্জাম জমা হচ্ছে। মামাবাবু রাতদিনই ব্যস্ত। কখনও একটা বাক্সে কাঠ-কয়লার গুঁড়ো ভরছেন, কখনও পোকা ধরার জাল সাজাচ্ছেন। হঠাৎ একদিন এরই ভেতর স্তম্ভিত হয়ে শুনলাম, পরের দিনই মামাবাবু সেই দূর দেশের জন্যে যাত্রা করবেন। আয়োজন সব সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

অবিশ্বাসের স্বরে বল্লাম,—"বলছেন কি মামাবাবু, সত্যি যাচ্ছেন !"

"হ্যাঁ, না গিয়ে কি করি !" এমনভাবে মামাবাবু কথাটা

বল্লেন, যেন তাঁর পিতৃদায় উপস্থিত। না গেলেই নয়।

খানিক চুপ করে থেকে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বল্লাম—"আমিও ত যাচ্ছি?"

মামাবাবু একটু মাথা চুলকে বল্লেন,—"বড্ড কষ্ট, অনেক বিপদ আপদ হতে পারে। ভাবছিলাম তুই না হয় থাক!"

আমি হেসে উঠলাম। মামাবাবু চল্লিশ বছর বয়সে ওই আয়েশী দেহ নিয়ে আমায় কষ্টের আর বিপদের ভয় দেখাচ্ছেন!

বল্লাম, "আমি যাবই।"

"তবে চ! অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হবে।" বলে মামাবাবু রাজী হয়ে চলে গেলেন। আমি কিন্তু নূতন অভিজ্ঞতার জন্যে মোটেই ব্যাকুল ছিলাম না। মামাবাবুকে সামলাবার জন্যই আমার যাওয়া।

পরের দিন আমাদের যাত্রার লটবহর দেখে আমি অবাক। কুড়িটি অশ্বতরের পিঠে বোঝা চাপিয়ে বিশজন চীনে সর্দ্দার আমাদের সঙ্গে চলেছে। তাদের সে বোঝার ভেতর খাবার দাবার, পোষাক পরিচ্ছদ, ওষুধপত্র থেকে বন্দুক, ডিনামাইট প্রভৃতি সব জিনিষ আছে। আমাদের চাকর মঙপো ছাড়া আমাদের অন্যান্য কাজ করবার জন্যে আর দুজন কাচীন পাহাড়ী আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।

সমস্ত ব্যাপারটাকে সামান্য পোকা-শীকারের অভিযান ভাবতে আমার ভারি মজা লাগছিল। আগে লোকে দুর্গম

বিপদসঙ্কুল দেশে যেত দামী ধনরত্নের খোঁজে। এখন সামান্য পোকা সংগ্রহ করবার জন্যে মানুষ তার চেয়েও বিপদসঙ্কুল দেশে প্রাণ হাতে নিয়ে যায়।

কিন্তু যাই হোক, এ মজা বেশী দিন রইল না। আমাদের এই অভিযান যে পোকা-শীকারের চেয়ে অনেক বেশী কিছু হবে, তার পরিচয় শীগগীরই পেয়ে গেলাম।

আমাদের প্রথম গন্তব্য স্থল ছিল হারটুজ্-কেল্লা। এই কেল্লা মিচীনা থেকে দুশ কুড়ি মাইল। এই পথটুকু শীতকালটা একরকম সুগমই বলা যেতে পারে। ঘোড়ায় চেপেও যাওয়া যায়।

দু'ধারে ঘন জঙ্গল, তারই ভেতর দিয়ে মানুষের ও ঘোড়ার পায়ে মাড়ান সঙ্কীর্ণ পথ। এই পথ দিয়ে তিনদিন গিয়েই আমরা ইরাবতীর দুই শাখার সঙ্গমস্থল পেলাম। তারপরই পাহাড় আরম্ভ। এখান থেকেই পথ একটু দুর্গম হ'তে আরম্ভ হয়েছে।

চারদিনের দিন আমাদের তাঁবু পড়ল ইরাবতীর পশ্চিম শাখার ধারে একটা ছোট পাহাড়ের উপত্যকায়। এটা কাচীন-দের দেশ। দূরে দূরে জঙ্গলের ভেতর থেকে কাচীনদের গ্রামের ছোট ছোট ঘরের চাল উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু গ্রামের সংখ্যা বেশী নয়। জঙ্গলই এখানে প্রধান। কাচীনরা বর্ম্মার এই সীমান্ত প্রদেশের এক দুদ্ধর্ষ জাত। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত এদের

উপদ্রবে আশপাশের সকলকে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হ'ত। তখন এরা প্রায়ই আশপাশের দেশ আক্রমণ করে বন্দীদের ক্রীতদাস করে আনত। এখন এরা শুনলাম অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে। কিন্তু একেবারে নয়।

এ দেশে বাঘের উপদ্রব বেশী বলে, আমাদের তাঁবু ও অশ্বতর বাহিনীকে সারারাত ভাল করে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হঠাৎ মাঝ রাতে ভয়ঙ্কর বাঘের গর্জ্জন ও মানুষের চীৎকার শুনে সভয়ে জেগে উঠলাম। মামাবাবু দেখলাম আমার আগেই বন্দুক হাতে তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি আমার বন্দুক নিয়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বাইরে বেশ কনকনে ঠাণ্ডা। অন্ধকার এমন গাঢ়, যে চোখ খুলে থাকা না থাকা সমান মনে হয়। তারই ভেতর আমরা কাণখাড়া করে খানিক অপেক্ষা করলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য, গোলমাল ও গর্জ্জন একবার উঠেই একেবারে যেন থেমে গেছে! জঙ্গলের গাঢ় নিস্তব্ধতা চারিধারে।

আমাদের কিছু দূরের তাঁবুতেই মঙ্‌পো ও আমাদের আর দুজন চাকর শোয়। তাদেরও কোন সাড়া শব্দ নেই। তারা কি এমন অঘোরে ঘুমোচ্ছে যে এই ভয়ানক শব্দ শুনতে পায়নি! তাদের একজনের ত জেগে পাহারা দেবার কথা! কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

অত্যন্ত বিপজ্জনক হলেও মামাবাবু এবার টর্চ্চ জ্বেলে সামনে এগিয়ে গেলেন। বাধ্য হয়ে আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। প্রথমে গিয়ে আমরা ঢুকলাম মঙপোদের তাঁবুতে, তাদের জাগাবার জন্যে। কিন্তু সেখানে গিয়ে যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁবুর ভেতরে মঙপো ও আমাদের কাচীন দুজন চাকরের কেউ নেই। তাদের বিছানা পাতা রয়েছে, তাঁবুর জিনিষপত্রও কিছু অগোছাল নয়, শুধু তাদেরই পাত্তা নেই।

আমাদের চীনে অনুচররা পাহাড়ের একটু নীচে তাদের আস্তানা গেড়েছিল। তারা তাঁবুটাবু এসব বালইএর ধার ধারে না, অতি বড় শীতেও ঘোড়ার লোমের কম্বল মুড়ি দিয়ে অনায়াসে বাইরে শুয়ে রাত কাটায়। মামাবাবু এবার তাদের সর্দ্দার লি-সিনের নাম ধরে উচ্চৈস্বরে চীৎকার করলেন। নিস্তব্ধ রাত্রে সে চীৎকার চারিধারের পাহাড়ে অদ্ভুত প্রতিধ্বনি তুললে। কিন্তু তবু কারু সাড়া পাওয়া গেল না। মামাবাবু ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করলেন।······

সামান্য একটা বন্দুকের আওয়াজ যে এমন শোনাতে পারে তা আগে কখনও জানতাম না। সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে চারিধারের পাহাড়ে অদ্ভুতভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে সে শব্দ যেন আমাদেরই চমকে দিলে। মনে হ'ল একটা নয়, আমাদেরই বন্দুকের সঙ্গে যেন দূরে দূরে আরো অনেক বন্দুক গর্জ্জন করে উঠেছে।

ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজের ফলও হ'ল অদ্ভূত। প্রতিধ্বনিটা ধীরে ধীরে পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে মিলিয়ে যেতে না যেতেই আমাদের চীনা অশ্বতর-চালকদের দলের গোলমাল শোনা গেল। আমরা টর্চ্চ জ্বেলে তাদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, বন্দুকের শব্দে ভীত হয়ে তারাও কয়েকজন খোঁজ করতে আসছে। তাদের ভেতর দলের সর্দ্দার লি-সিনও আছে।

মাঝপথে দেখা হতেই মামাবাবু একটু কঠোর স্বরে লি-সিনকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এত ডাকাডাকিতেও সে সাড়া দেয় নি কেন। লি-সন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়ল এবার। কুণ্ঠিত ভাবে জানালে সারাদিনের পরিশ্রমের পর গভীর ভাবে তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমাদের ডাক শুনতে পায় নি তাই।

মামাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"সে কি, তোমরা বাঘের গর্জ্জনও শুনতে পাও নি!"

লি-সিন আমাদের মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বল্লে—"বাঘের গর্জ্জন আবার কোথায়?"

বাঘের গর্জ্জন কোথায়? এরা বলে কি! এবার মামাবাবু ও আমি হতভম্ব হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। লি-সিন কিন্তু অত্যন্ত জোর গলায় জানালে যে কোন রকম বাঘের গর্জ্জন কোথাও হয় নি। হ'লে তারা হাজার ঘুমোলেও নিশ্চয়ই শুনতে পেত।

বাঘের গর্জ্জনের ব্যাপারটা রহস্য হয়ে উঠলেও মঙপো ও কাচীন চাকর দুজনের অন্তর্ধানের কারণ জানতে পেরে না হেসে থাকতে পারলাম না। চীনেদের দেখাদেখি হতভাগাদের আজ সন্ধ্যার পর একটুখানি তাদের মত নলের ভেতর দিয়ে ধোঁয়া খাবার লোভ হয়েছিল। সে লোভের শাস্তি তাদের হাতে হাতে মিলেছে। চীনেদের চণ্ডুর নলে কয়েক টান দিয়েই তারা এমন কাৎ হয়েছে যে নিজেদের তাঁবুতে উঠে আসতেও তাদের ক্ষমতায় কুলোয় নি। চীনেদের সঙ্গেই তাদেরই কম্বল চাপা দিয়ে দুজনে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে।

তাঁবু ছেড়ে এ ভাবে চলে যাওয়াটা অত্যন্ত অন্যায় হলেও তখন আর তাদের ভৎর্সনা করতে যাওয়া বৃথা। বিশেষ করে তাদের অবস্থার কথা ভেবেই হাসি পাচ্ছিল। লি-সিনের কাছে ব্যাপারটা শুনে মামাবাবু কোন রকমে হাসি চেপে বল্লেন,—"থাক, হতভাগাদের আর জাগিয়ে কাজ নেই। এই ঠাণ্ডায় সারারাত বাইরে শুয়ে কাল নিমোনিয়া ধরলে মজাটা আরো ভালো করে বুঝবে।"

লি-সিনের দলকে এবার বিদায় দিয়ে আমরা আবার তাঁবুর দিকে ফিরলাম। আমি একটু হেসে মামাবাবুকে বল্লাম,—"মিছিমিছি কি ভয়টাই পেলাম বলুন ত।"

মামাবাবু গম্ভীরভাবে শুধু "হুঁ" ছাড়া আর কিছু বল্লেন না।

তাঁবুতে ঢুকতে গিয়েই কিন্তু দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বেরুবার সময় আমরা যে তাঁবুর কাপড়ের দরজা আটকে রেখে এসেছিলাম এ কথা আমাদের স্পষ্ট মনে আছে। এখন কিন্তু তাঁবুর দরজা দেখা গেল খোলা। আমাদের এই সামান্য অনুপস্থিতির সুযোগে কেউ যে এসে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কে সে? তার উদ্দেশ্যই বা কি?

উদ্দেশ্য বোঝা আরো কঠিন এই জন্যে যে তাঁবুর ভেতরকার সমস্ত জিনিষ যথাস্থানেই আছে। কোন কিছু চুরি গেছে বলে আমরা বুঝতে পারলাম না। আমর সোনার হাতঘড়িটা শোবার আগে বিছানার ধারেই রেখেছিলাম। সেটা সেইখানেই এখনো টিক্ টিক্ করছে। আমাদের দামী গরম কাপড়ের পোষাকগুলোর ওপরও কেউ নজর দেয় নি।

তাঁবুর দরজা আটকে দেওয়ার কথা স্পষ্ট মনে না থাকলে এ ব্যাপারও বাঘের গর্জ্জনের মত আমাদের মনের ভুল ভাবতে পারতাম। কিন্তু তার ত পথ নেই।

ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না পেরে সমস্ত রাত দুর্ভাবনায় ভাল করে ঘুমোতেই পারলাম না। সকাল হতে না হতেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

চারিদিকে ঘন কুয়াশা, জঙ্গলের গাছগুলো থেকে বৃষ্টির ফোঁটার মত টপ্ টপ্ করে শিশির পড়ছে। কুয়াশার অস্পষ্টতায় হঠাৎ মনে হতে পারে যেন চারিদিকে কোমল দ্রুত

পায়ে বনের পরীরাই চলা ফেরা করছে। কিন্তু তখন অমন কল্পনা উপভোগ করবার মত মনের অবস্থা নয়। রাত্রের অদ্ভুত ব্যাপারটার কোন অর্থ না পেয়ে মেজাজ তখনও বিগড়ে আছে।

মামাবাবু আমার মতই ঘুমোতে পারেন নি সারারাত। সকাল হবার আগে থাকতে আলো জ্বেলে তিনি তাঁবুর ভেতর তাঁর বাক্স-টাঙ্ক ঘেঁটে কি করছিলেন। দুচারবার তাঁবুর সামনে পায়চারি করতে হঠাৎ আমার চোখ পড়ল নীচের দিকে। ভাল করে একটু লক্ষ্য করে দেখেই আমি উত্তেজিত স্বরে ডাকলাম—“মামাবাবু!”

আমার গলার স্বর বোধ হয় একটু বেশী রকম অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। মামাবাবু ভীত ভাবে বাইরে ছুটে এসে বল্লেন,—“কেন, কি হয়েছে?”

আমি নীচের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্লাম—“দেখতে পাচ্ছেন, কিসের পায়ের দাগ?”

মামাবাবু কিন্তু আমার এ আবিস্কারে মোটেই উৎসাহ দেখালেন না। নিতান্ত শান্তভাবে এবার বল্লেন,—“দেখতে পাচ্ছি বাঘের পায়ের দাগ। এ দাগ তাঁবুর ভেতরেও আছে।”

“তাঁবুর ভেতরেও?” আমি একেবারে চমকে উঠলাম।

“হ্যাঁ, তাঁবুর ভেতরেও আছে। কালকেই আমি দেখেছি।”

আমি সবিস্ময়ে বল্লাম—“তাহলে কাল আমাদের তাঁবুতে বাঘই ঢুকেছিল।”

মামাবাবু খানিক চুপ করে থেকে একটু হেসে বল্লেন,—"কিন্তু তাঁবুর দরজা খুলে ভেতর থেকে কম্পাস চুরি করে নিয়ে যায় এ রকম বাঘের কথা ত শুনিনি।"

আমি সত্যই বিমূঢ় হয়ে গেছলাম। মামাবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার বল্লেন,—"সত্যিই তাই। কাল আমাদের তাঁবুর এত জিনিষ থাকতে শুধু কম্পাসটি চুরি হয়ে গেছে। অথচ কম্পাসটি ছিল আমার ব্যাগের একেবারে তলায়।"

"আর কোন জিনিষ চুরি যায়নি? ভাল করে দেখেছ ত?"

"এতক্ষণ ধরে ত তাই দেখলাম। আমার কাগজপত্রের বাক্সটা অবশ্য ঘাঁটাঘাঁটি করেছে কিন্তু সব কিছু ফেলে নিয়ে গেছে শুধু কম্পাসটি।"

আমি হতভম্ব হয়ে বল্লাম—"তাহলে কি বলতে চাও, কাল রাত্রে ওই যে-টুকু সময় আমরা তাঁবুতে ছিলাম না, তারই ভেতর বাঘ ও চোর দুই ঢুকেছিল তাঁবুতে?"

মামাবাবু বল্লেন,—"তা ছাড়া কি বলব। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে—বাঘের পায়ের দাগ যেখানে পাওয়া যাচ্ছে স্পষ্ট, সেখানে মানুষের পায়ের কোন চিহ্নও নেই।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যত ভাবছিলাম, গত রাত্রের রহস্য তত যেন আরো জটিল হয়ে উঠছিল। আমরা এই পাহাড় জঙ্গলের দেশে নিরাপদে থাকব ভেবে অবশ্য আসি নি। বিপদ আছে সে কথা আমরা জানতাম কিন্তু এ রকম দুর্ব্বোধ রহস্যজাল আমাদের ঘিরবে এ কথা আমরা কল্পনাও করিনি! যে দিক দিয়েই ভাবতে যাই সমস্ত ব্যাপারটার কোন মানেই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এ যেন ভৌতিক ব্যাপার। আসলে আমাদের খুব বেশী কোন ক্ষতি না হলেও আমরা কিছুতেই স্বস্তি বোধ করতে পারছিলাম না। কেমন যেন মনে হচ্ছিল কি গভীর একটা চক্রান্ত আমাদের চারিধারে জাল বিস্তার করে আছে। কালকের ব্যাপারে তার সামান্য একটু আভাষ পেয়েছি মাত্র।

সেদিন ইচ্ছে করেই আমরা অনেক বেলা পর্য্যন্ত তাঁবু আর তুললাম না। বিপদের আভাষ যখন পাওয়া গেছে তখন এর পর থেকে আমাদের আরো সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে হবে। মামাবাবু তারই ব্যবস্থা করছিলেন। এর মধ্যে লি-সিন দুবার এসে কখন যাত্রা সুরু হবে তার খোঁজ করে গেছে। এর পর পথ নাকি অত্যন্ত গভীর বিপদসঙ্কুল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি রওনা না হলে আমরা সন্ধ্যার আগে সে জঙ্গল পার হতে পারব না এই তার বক্তব্য।

লি-সিন দ্বিতীয়বার এসে চলে যাবার পর আমি একটু ইতস্ততঃ করে মামাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—"লি-সিনকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হয় মামাবাবু?"

মামাবাবু আমার প্রশ্নে যেন অবাক হয়ে বল্লেন—"কেন? খুব ভালো লোক ত!"

একটু চুপ করে থেকে বল্লাম—"কিন্তু আমার একটা কথা মনে হচ্ছে!"

মামাবাবু একটু হেসে বল্লেন,—"কি?"

বল্লাম—"বিশেষ করে কালকে রাত্রেই মঙপো আর কাচীন চাকর দুটোর চণ্ডু খেতে গিয়ে অজ্ঞান হওয়া একটু সন্দেহজনক বলে মনে হয় না আপনার!"

মামাবাবু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—"হতে পারত, যদি লি-সিনকে আমি না জানতাম ভালো করে। এ রকম বিশ্বাসী লোক খুব কম পাওয়া যায়। লি-সিন আমার সঙ্গে আগেও অনেক জায়গায় গিয়েছে।"

এর পর আর আমি কিছু বলতে পারলাম না। সত্যিই লি-সিনকে সন্দেহ করবার স্পষ্ট কোন কারণ নেই। তাঁবুর ভেতর বাঘের পায়ের রহস্যজনক দাগ ও কম্পাস চুরির সঙ্গে তার সংশ্রব কল্পনা করাও অসম্ভব। তবু মনের ভেতর একটা খোঁচা আমার থেকেই গেল। এই সন্দেহের মীমাংসা সেই সময়েই না করে'

নেওয়ার জন্যে একদিন আমাদের সর্ব্বনাশ হবার উপক্রম হবে তখন যদি জানতাম !

সেদিন তাঁবু তুলে যাত্রা করার পূর্ব্বে আর একটি সংবাদ পেয়ে আমরা বিচলিত হলাম একটু। আমরা রওনা হবার উপক্রম করছি এমন সময় নিকটস্থ কাচীনদের গ্রামের মোড়ল এল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে কয়েকজন অনুচর। আমাদের তখন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। তবু লৌকিকতা বজায় রাখবার জন্যে আলাপ করতে বসতেই হ'ল। কাচীনদের রাজ্যে এসে তাদের অপমান করা ত আর যায় না।

মোড়লের আলাপ করতে আসার উদ্দেশ্য জানতে অবশ্য দেরী হ'ল না। দু-এক কথার পর সে জানালে তার কাছে অত্যন্ত দামী দুষ্প্রাপ্য নানা রকম জানোয়ারের ছাল আছে। খুশী হয়ে সে আমাদের কিছু উপহার দিতে চায়। বিনিময়ে সে কিছুই চায় না। শুধু এই জঙ্গলের দেশে গুলি বারুদের বড় অভাব। আমরা তাকে সামান্য কিছু গুলি বারুদ দিয়ে নিশ্চয় সাহায্য করব সে জানে।

মামাবাবু তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে আমাদের সঙ্গে গুলি বারুদ খুব অল্পই আছে। আমাদের নিজেদের পক্ষেই তা যথেষ্ট নয়, সুতরাং তা থেকে আমাদের কিছু দেওয়া অসম্ভব। সেই জন্যেই আপাততঃ তার চামড়ার লোভ আমাদের সম্বরণ করতে হল।

কাচীন মোড়ল কিন্তু নাছোড়বান্দা। এবার সে জানালে যে সাধারণ চামড়া নয়, একটা আসল সাদা বাঘের ছাল সে আমাদের দিতে প্রস্তুত। গুলি বারুদ না পারি আমরা কিছু কেরোসিন তেল ত তাকে দিতে পারি।

মামাবাবু এবার হেসে ফেলে বল্লেন, যে সাদা বাঘের চামড়া অত্যন্ত মূল্যবান হলেও আমাদের এখন মোট বাড়াবার উপায় নেই। ফেরবার পথে সম্ভব হলে তিনি সেটি নিয়ে যাবেন।

কাচীন মোড়ল মনে হ'ল অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবু ওঠবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করে সে বল্লে যে দুদিন আগে আমাদের আগের দলের কাছে সে বিস্তর উপহার পেয়েও সাদা বাঘের চামড়া দেয় নি। সাদা বাঘের চামড়া দশ বছরে একটা মেলে কি না সন্দেহ। আমরা এ দুষ্প্রাপ্য জিনিষ হেলায় ফেলে……

মামাবাবু এবার কিন্তু মোড়লকে তার বক্তৃতার মাঝেই থামিয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আমাদের আগের দল? আমাদের আগের দল কি বলছ?"

মোড়ল মাটিতে তার বল্লম ঠুকে জানালে—মিছে কথা সে কিছু বলছে না, আগের দলকে সে সত্যিই দুদিন আগে অনেক জিনিষের বদলেও সাদা বাঘের চামড়া দেয় নি।

মামাবাবু উত্তেজিত হয়ে বল্লেন—"না, না তা বেশ করেছ। কিন্তু আগের দল কারা?"

সে কি, দুদিন আগেই ত আমাদের মত আরেক দল এই

পথে গেছে। আমরা কি তা জানি না ?—এবার মোড়ল জিজ্ঞাসা করলে অবাক হয়ে।

মামাবাবু মনে হ'ল অনেক কষ্টে নিজের উত্তেজনা শান্ত করে সহজ গলায় বলবার চেষ্টা করলেন—"ও বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা কি রকম দল বল দেখি ?"

দল আর কি রকম। আমাদের চেয়ে কিছু বড় হবে, মোট-ঘাটও তাদের অনেক বেশী।

মামাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—"তাদের দলে কি সাহেব আছে ?"

সাহেব ? মোড়ল খানিকক্ষণ ভেবে বল্লে,—সাহেব আছে বলে ত তার মনে হচ্ছে না। একজন চীনাই দলের নেতা।

মামাবাবু হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমাদের শাদা বাঘের ছাল উপহার দেবার কোন আশা আর নেই দেখে কাচীন সর্দ্দার শেষে ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় নিলে। আমাদের তাঁবুও তারপর উঠল।

আজকের পথ ঘন বিপদ-সঙ্কুল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। জঙ্গলটি আবার বেশ বড়। সন্ধ্যার আগেই সেটি পার হতে না পারলে বিশেষ ভয়ের কথা। লি-সিন ও তার দলের লোকেরা আমাদের অশ্বতর-বাহিনীকে তাই একটু জোরেই হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। জঙ্গলে বিপদের আশঙ্কা আছে বলে আজকে মঙপোকে বন্দুক দেওয়া হয়েছে।

সে চলেছে অশ্বতর-বাহিনীর আগে লি-সিনের সঙ্গে। আমরা দুজনে সশস্ত্র হয়ে পেছনে চলেছি। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে অত্যন্ত সরু পথ গিয়েছে। পাশাপাশি দুটি ঘোড়া যাবার রাস্তাও সব জায়গায় নেই। আমাদের অশ্বতর-বাহিনীর দীর্ঘ সারি—প্রায় অধিকাংশই জঙ্গলের ভেতর আড়াল হয়ে আছে। কাচীন মোড়লের কাছে সেই সংবাদ শোনা অবধি মামাবাবু কেমন অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেছলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পথে যেতে যেতেও তিনি কোন কথা বল্লেন না। অবশেষে আমিই একটু অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"ব্যাপারটা কি বলুন ত?"

মামাবাবু খানিকক্ষণ আমার কথার উত্তর দিলেন না। তারপর অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বল্লেন,—"ব্যাপার অত্যন্ত অদ্ভুত।"

আমি একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লাম,—"অদ্ভুত বলছেন কেন? আমাদের আগে আরেক দল এই পথে গেছে বলে?"

মামাবাবু বল্লেন—"হুঁ"

"কিন্তু সেটা এমন কি আশ্চর্য্য ব্যাপার?"

মামাবাবু এবার উত্তেজিত ভাবে বল্লেন—"আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়! এই দুর্গম দেশে এ পর্য্যন্ত বৃটিশ সৈন্য ও রাজকর্ম্মচারী ছাড়া কালেভদ্রেও সভ্য জগতের কেউ আসেনি; আমাদের অভিযানই এই পথে প্রথম। অথচ ঠিক আমাদের অভিযানের

সঙ্গে সঙ্গেই শোনা যাচ্ছে আরেকটি দল এই পথে বেরিয়েছে, তাদের নেতা আবার চীনা, এটা আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় ?”

আমি কিছু বলবার আগেই মামাবাবু আবার বল্লেন,—“এটাকে নিছক ঘটনার মিল বলে উড়িয়ে দিতেও আমি পারতুম যদি না মিচিনার কয়েকটা ব্যাপার এই সঙ্গে আমার মনে পড়ত।”

অবাক হয়ে বল্লাম,—“মিচিনায় আবার কি হয়েছিল ? কই আমি ত জানিনা !”

মামাবাবু বল্লেন,—“তোকে তখন সেকথা বলিনি। ব্যাপারটা তুচ্ছ মনে করে বলবার প্রয়োজনও বোধ করিনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা তুচ্ছ নয়। মিচিনাতে আমাদের যাত্রা করবার দিন ছয়েক আগে একজন অচেনা চীনেম্যান আমায় অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে। সেদিন সার্ভে অফিস থেকে সন্ধ্যেবেলা কয়েকটা ম্যাপ নিয়ে বেরুচ্ছি, হঠাৎ গেটের কাছে লোকটা আমায় টুপি তুলে নমস্কার করলে। সাজ পোষাক তার নিখুঁত সাহেবী, মুখ না দেখলে চীনেম্যান বলে চেনবার জো নেই। লোকটাকে কখনো দেখেছি বলে মনে হ'ল না, তাই শুধু প্রতিনমস্কার করেই চলে আসছিলাম। হঠাৎ লোকটা আমার নাম ধরে ডেকে বল্লে,—মিঃ রায়, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে। আপনি ত বাড়ি যাচ্ছেন, এটুকু পথ আপনার সঙ্গে যেতে পারি কি ?”

একটু অস্বস্তি হলেও আমি তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলাম, কিন্তু লোকটার প্রথম কথায় একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। সে বল্লে, "মিঃ রায়,, আপনার অভিযানের সার্থকতা কামনা করি।"

গোপনে মিচিনার কয়েকজন বড় সরকারী কর্ম্মচারীকে ছাড়া আমার অভিযানের কথা আমি কাউকে বলিনি। এ লোকটা সে কথা জানল কেমন করে বুঝতে না পেরে আমি তাকে উল্টো প্রশ্ন করলাম।—"আমি কোন অভিযানে যে যাচ্ছি একথা আপনাকে কে বল্লে?"

চীনেম্যানের মুখ দেখেও মনের ভাব বোঝবার যো নেই। তবু মনে হ'ল লোকটা যেন প্রথমটা একটু ভড়কে গেল। তারপরেই সামলে নিয়ে কথাটা ঘুরিয়ে বল্লে,—"আপনি কি কথাটা গোপন রাখবার জন্যে ব্যস্ত?"

বল্লাম,—"না তা নয়, তবে কথাটা কেউ জানে না।"

চীনেম্যান বল্লে,—"ভালো খবর এমন ছড়িয়ে যায় একটু আধটু। আপনার তাতে দুঃখিত হবারই বা কি আছে! এমন কিছু কাজ ত করছেন না যা লুকিয়ে রাখা দরকার।"

আমিই এবার একটু অপ্রতিভ হয়ে বল্লাম,—"না না, তা নয়, আমি শুধু একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলাম প্রথমটা।"

এইবার লোকটার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই করলাম। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। জোঁকের

মত আমার সঙ্গে লেগে থেকে সে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। আমার এ অভিযানের লক্ষ্য কোন জায়গা! কেন আমি হঠাৎ এখন কীট-সন্ধানে চলেছি। খনিজ সম্বন্ধেই আমার উৎসাহ হবার কথা, পোকামাকড় নিয়ে আমি আবার মাথা ঘামাচ্ছি কেন? কতজন লোক আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে, ইত্যাদি।

একজন চীনেম্যানের এ বিষয়ে এত কৌতূহল একটু অস্বাভাবিক ঠেকলেও তখন আর এ নিয়ে মাথা ঘামাই নি। সত্যিই আমাদের অভিযানে গোপন করবার ত কিছু নেই। যদি কেউ সে সম্বন্ধে জানতে চায় ত জানুক না। লোকটা বাড়ির কাছাকাছি এসে বিদায় নেবার পর আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কথা ভুলে গেছলাম। লোকটার সঙ্গে তারপর আর দেখাও হয়নি।

কিন্তু তারপর আর একটা ব্যাপার ঘটে যার সঙ্গে সেই চীনেম্যানের সংশ্রব তখন অনুমান করতে না পারলেও এখন পারছি। আমাদের যাত্রা সুরু করবার দুদিন আগে একটা উড়ো চিঠি আমার নামে আসে। চিঠিটা ইংরাজিতে টাইপ করা; কোন নাম নেই, কোন সম্ভাষণ নেই, শুধু একধারে নীল কালিতে একটা ছবি আঁকা। ছবিটা একটু অসাধারণ বলেই এখনো মনে আছে—একটা বাদুড়ের দেহে একটি সুন্দরী মেয়ের মুখ বসান। চিঠিটাতে একরকম ভয় দেখিয়েই আমায়

এ অভিযানে যেতে বারণ করা হয়েছিল। তাতে আরো লেখা ছিল যে আমি যদি নেহাৎই এ অভিযানে যেতে চাই তাহলে অন্ততঃ আর এক বছর অপেক্ষা করে যেন যাই।

সত্যি কথা বলতে কি, এ চিঠিটা আমি আমার কোন বন্ধুর পরিহাস বলেই তখন উড়িয়ে দিয়েছিলাম। দু একজন বন্ধু আমার এরকম বিপদসঙ্কুল দেশে এ বয়সে যাওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। ভেবেছিলাম তাঁরাই হয়ত এ চিঠি দিয়েছেন। মেয়ে-মুখো বাদুড়ের ছবিটাতে ত আমার মজাই লেগেছিল।"

আমি এতক্ষণ অবাক হয়ে মামাবাবুর কথা শুনছিলাম। মামাবাবু এবার চুপ করতে জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু এসব ব্যাপারের অর্থ আপনার কি মনে হয়? এ রকম চিঠি দেওয়া, এ রকম প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য কি? কারা এ সব করছে?"

"সেইটে বুঝতে পারছিনা বলেই ত আরো অদ্ভুত লাগছে। আমরা নিরীহ সাধারণ লোক, চলেছি সামান্য পোকা মাকড়ের খোঁজে। খাঁটি বৈজ্ঞানিকদের ছাড়া আর কারো আমাদের ব্যাপারে নজর দেবার কথা নয়। আমাদের বিরুদ্ধে এ রকম ষড়যন্ত্র করে আমাদের বাধা দেওয়ায় কার কি স্বার্থ থাকতে পারে কিছুই ত ভেবে পাচ্ছি না। তা ছাড়া ঠিক আমরা যে সময়ে যে পথে বেরিয়েছে, সেই সময়ে সেই পথে আরেকটা চীনে দলের যাতায়াত অত্যন্ত রহস্যজনক!......"

মামাবাবু আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল।

পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলবার জন্যে আমরা এতক্ষণ খুব ধীরে ধীরে ঘোড়া চালাচ্ছিলাম। ঘন জঙ্গলের সঙ্কীর্ণ পথে আমাদের অশ্বতরবাহিনী যে একেবারে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেছে তা এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ সামনের দিকে জঙ্গলের ভেতর বাঘের গর্জ্জন ও মানুষের আর্ত্তনাদ শুনে শিউরে উঠলাম।

এখানে জঙ্গল এমন ঘন ও ওপরের দিকে লতায় এমন আচ্ছন্ন যে দিনের বেলাই সব আবছা দেখায়। সেই অস্পষ্ট আলোয় সঙ্কীর্ণ পথে ঘোড়া যতদূর সম্ভব জোরে চালিয়েও আমাদের ঘটনা স্থানে পৌঁছোতে বেশ দেরী হয়ে গেল। লি-সিন দেখলাম আমাদের আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছে। অন্যান্য চীনারাও চারিধারে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।

আমরা যেতে ভীড় সরে গেল। এইবার দেখতে পেলাম সঙ্কীর্ণ পথের ধারে একটা ঝোপের পাশে নরম কাদা ও রক্তে মাখামাখি হয়ে আমাদের একজন চীনা চালকের দেহ পড়ে রয়েছে।

লোকটার মুখে কাণ থেকে নাক পর্য্যন্ত দগদগে একটা ক্ষত, তা থেকে প্রচুর রক্ত পড়ছে। তার গায়েও নানা জায়গায় আঁচড়ের দাগ। তখনও লোকটা একেবারে মারা যায়নি। লি-সিন তাকে একটু কাত করে তুলে ধরে তার

মুখে জল দিচ্ছিল। আমরা নীচু হয়ে তার কাছে বসতেই আমাদের দিকে ব্যাকুল ভাবে চেয়ে সে যেন কি একটা কথা বলবার চেষ্টা করল। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। কিন্তু জীবনী-শক্তি তার তখন ফুরিয়ে গেছে। অস্পষ্ট ভাবে একটা শব্দ উচ্চারণ করেই সে একেবারে নেতিয়ে পড়ল।

মামাবাবুর প্রশ্নে এবার লি-সিন সমস্ত ব্যাপার খুলে বল্লে। আমাদের মত সেও বাঘের গর্জ্জন আর মানুষের আর্ত্তনাদ শুনে পেছন ফিরে আসে। এসে এই ব্যাপার দেখতে পায়। এখানে পথ সঙ্কীর্ণ বলে অশ্বতরচালকেরা একটু ছাড়াছাড়ি ভাবে যাচ্ছিল। যে লোকটি মারা গেছে সে একটু একলা পড়ে গেছল বলে বোধ হয়। কারণ বাঘের গর্জ্জন ও তার আর্ত্তনাদ শুনলেও এই লোকটির পেছনের ও সামনের কোন চালক বাঘ দেখতে পায়নি। চক্ষের নিমিষে সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেছে। কাছের লোকেরা এসে শুধু লোকটিকে এই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পায়।

মামাবাবু লি-সিনের কথা শুনতে শুনতে নীচের দিকে চেয়ে কি যেন দেখছিলেন। নীচে নরম মাটিতে বাঘের পায়ের দাগ আমি আগেই দেখতে পেয়েছিলাম। বল্লুম—"ও আমি আগেই দেখেছি! বাঘের পায়ের ত স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে।"

মামবাবু গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "স্পষ্ট বলেই ত দেখছি!" তারপর তিনি যা করে বসলেন তাতে ত আমরা সবাই অবাক।

হঠাৎ দেখি মাটির ওপর নীচু হয়ে, পকেট থেকে একটা মাপবার ফিতে বার করে তিনি বাঘের দুটো পায়ের দাগের মধ্যেকার ব্যবধানটা মাপছেন!

দু তিনটি দাগের তফাৎ মেপে দেখে মামাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে লি-সিনকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাদের অশ্বতরগুলি সব ঠিক আছে কিনা।

লি-সিন বল্লে, "না, যেটিকে এই লোকটি চালাচ্ছিল, বাঘের ভয়েই বোধ হয় সে বনের ভেতর পালিয়েছে। তার আর কোন পাত্তা নেই।"

মামাবাবু একটু চুপ করে থেকে বল্লেন,—"আমিও তাই ভেবেছিলাম। যাই হোক আমাদের দেরী করবার সময় নেই, এই লোকটির মৃতদেহ তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি এ জঙ্গল পার হবার ব্যবস্থা কর।"

লি-সিন এ কথায় যেন অবাক হয়ে গেল একটু। একটু ইতস্ততঃ করে সে জানালে যে এই ঘন জঙ্গলে পলাতক অশ্বতরটি এখনো বেশীদূর যেতে পারে নি। এখনো একটু খোঁজ করলে তাকে পেতে পারি। যদি নেহাৎ সে বাঘের হাতেই পড়ে থাকে তাহলেও আমাদের দামী জিনিষপত্রগুলো উদ্ধার হবে।

লি-সিনের কথা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলেই আমার মনে হ'ল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মামাবাবুর মত বদলাল না। তিনি শুধু বল্লেন,—"না সে হবার নয়, তোমরা এগিয়ে চল।"

আমি এবার বাধা না দিয়ে পারলাম না। বল্লুম—"আপনি করছেন কি মামাবাবু ? সামান্য একটু খোঁজ করলে জিনিষগুলো যদি পাওয়া যায় তাহলে সে চেষ্টা আমাদের করা উচিত নয় কি ? জঙ্গলের ভেতর বেশীদূর সে এখনো নিশ্চয়ই যায়নি।"

মামাবাবু অদ্ভূতভাবে এবার হেসে বল্লেন—"তা হয়ত যায়নি। কিন্তু জিনিষগুলো পাবার আশা আর নেই।"

"কেন নেই ?"

মামাবাবু তাঁর পকেট থেকে একটা নোটবুক বার করে আমায় দেখিয়ে বল্লেন—"যে চীনে সর্দ্দার মারা গেল তার জিন্মায় আমাদের কি ছিল দেখছিস—আমার সারভে করবার নানারকম যন্ত্রপাতির বাক্স। পোকা শীকারে বেরিয়েও কাজে লাগতে পারে ভেবে এগুলো সঙ্গে নিয়েছিলাম। এ যন্ত্রপাতি ফিরে পাবার নয়।"

একটু বিরক্ত হয়েই এবার বল্লাম—"আপনার হেঁয়ালি আমি কিছু বুঝতে পারছিনা।"

মামাবাবু তাঁর ঘোড়ায় চেপে বল্লেন, "চ, যেতে যেতে সব কথা বলছি! এখন দেরী করবার সময় নেই।"

ঘোড়ায় চেপে খানিকদূর এগিয়ে যাবার পর মামাবাবু বল্লেন. "আমাদের দলের মধ্যে বাঘের উপদ্রবটা অকটু অদ্ভূত ধরণের নয় কি ?"

"কেন ?"

"একবার বাঘের উপদ্রবের সঙ্গে গেল কম্পাস চুরি, আর একবার বাঘ এসে এমন লোককে আক্রমণ করলে যার জিম্মায় দামী জরিপের যন্ত্রপাতি !"

আমি এবার বিমূঢ় ভাবে বল্লাম—"এর মানে আপনি কি বলতে চান ?"

"এর খানিকটা মানে বাঘের পায়ের দাগ যেখানে পড়েছে সেখানটা ভাল করে লক্ষ্য করলে তুই নিজেই বুঝতে পারতিস্। লক্ষ্য করেছিস্ কিছু ?"

আমি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে এবার বল্লাম—"বাঃ, বাঘের পায়ের দাগ আমিই ত আগে দেখেছি !"

মামাবাবু আমায় যেন ধমক দিয়েই এবার বল্লেন,—"কিচ্ছু দেখিস নি ! দেখলে বুঝতে পারতিস্ ও বাঘের পায়ের দাগ নয়। হতে পারে না।"

"বাঘের পায়ের দাগ নয় !"—আমি হতভম্ব হয়ে এবার উচ্চারণ করলাম।

"না, নয়। বাঘেরা নেহাৎ হালকা জানোয়ার নয়। অত বড় যে বাঘের থাবা, তার ওজন কম পক্ষেও কত হয় জানিস ? অন্ততঃ ছ' মণ ! ছ' মণ বাঘের পায়ের দাগ নরম কাদাতে আরও ঢের গভীর ভাবে পড়ত। তা ছাড়া বাঘ কি কখন দুপায়ে হাঁটে ?"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুপায়ে হাঁটার খবর কোথায় পেলেন ?"

"পেলাম মেপে। বাঘের মত চার পেয়ে জানোয়ারের আগু-পাছু পায়ের দাগের মধ্যে ব্যবধান আর তুপায়ে যে হাঁটে তার দাগের ব্যবধান আলাদা !"

"তবে কি......"

মামাবাবু গম্ভীর ভাবে আমার কথার মাঝখানেই বল্লেন,— "হ্যাঁ, আমাদের তাঁবুতে ঢুকে যে কম্পাস চুরি করেছে, ও আজ আমাদের চীনে সর্দ্দারকে যে মেরেছে, সে, আর যে রকম প্রাণীই হোক, বাঘ নয়,—তার পা মাত্র তুটি।"

মামাবাবুকে আরো একটু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম এমন সময় পেছনে পায়ের দ্রুত শব্দ পেলাম। ফিরে দেখি, লি-সিন দ্রুতবেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে ! ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে আমরা ঘোড়া রুখলাম। লি-সিন হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের কাছে এসে পৌঁছোতেই মামাবাবু অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি লি-সিন ?"

লি-সিন ডান হাতটা এবার উঁচু করে ধরলে ; হাতে তার খেলনার ছোরার মত একটি অস্ত্র, কিন্তু সে অস্ত্রের ধারাল ফলাটা জমাট রক্তে তখনও লাল। সেই ছোরাটি তুলে ধরে উত্তেজিত ভাবে লি-সিন যা বল্লে তার মর্ম্ম এই যে, চীনে চালকের মৃতদেহটা বয়ে আনবার জন্যে তোলার সময় তারা তার পিঠে এই অস্ত্রটি

বিদ্ধ দেখতে পায়। বাঘের হাতে যে মরেছে তার পিঠে এ রকম অস্ত্র বিদ্ধ থাকার কোন মানে বুঝতে না পেরে ভয় পেয়ে লি-সিন মামাবাবুকে এটি দেখাতে এনেছে।

মামাবাবু সাবধানে লি-সিনের হাত থেকে ক্ষুদে ছোরাটি তুলে নিয়ে বল্লেন—"যাক, এবার চরম প্রমাণ পাওয়া গেল। দেখছিস্!"

কিন্তু তখন অন্য কোন দিকে দেখবার আমার ক্ষমতা নেই। ছুরি সমেত ডান হাতটা উঁচু করে ধরার সঙ্গে সঙ্গে লি-সিনের জামার ঢোলা হাতাটা নীচে খসে গেছল। তার সেই অনাবৃত হাতের দিকে চেয়ে আমি তখন আবিষ্টের মত চোখ আর ফেরাতে পারছি না।

আমার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে হঠাৎ চমকে লি-সিন তাড়াতাড়ি হাতটা নামিয়ে ফেললে, কিন্তু তখন আমার দেখতে কিছু বাকী নেই।

লি-সিনের ডান হাতের উপরে নীল একটি অদ্ভূত উল্কি আঁকা,—উল্কির ছবিটি মেয়ের মুখ বসান একটা বাদুড়ের!

লি-সিন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি দলের সকলের কাছে ফিরে গেল। আমি খানিকক্ষণ ধরে কি করা উচিত কিছুই বুঝতে পারলাম না। মামাবাবু তখন ছুরিটি বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে বলছেন—"ছুরিটা সাধারণ বর্মি ছুরি নয়,—এরকম বাঁটের কারুকাজ বর্মার কোথাও হয় না বলেই আমি জানি।"

আমার কিন্তু মামাবাবুর কথায় বিশেষ কান ছিল না। লি-সনের হাতে যা দেখেছি তার কথা মামাবাবুকে বলব কিনা তাই ঠিক করতেই আমি তখন পারছিনা। শেষ পর্য্যন্ত আমার মনে হল একথা আপাততঃ গোপন করে যাওয়াই ভালো। মামাবাবুর লি-সিনের ওপর অগাধ বিশ্বাস। লি-সিন সম্বন্ধে আমার সন্দেহ যে অমূলক নয় তার যথেষ্ট প্রমাণ যতদিন সংগ্রহ করতে না পারছি ততদিন কোন কথা তাঁকে জানাব না। ইতিমধ্যে লি-সিনের ওপর নজর রেখে আমার নিজের অনুসন্ধান নিজেই চালাতে হবে।

মামাবাবু ছুরিটা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন,—"এ রকম জিনিষ কোথাও দেখেছিস ?"

বল্লাম—"না, কিন্তু চরম প্রমাণ একে বলছ কেন ?"

তিনি একটু হাসলেন। তারপর ছুরিটা আবার আমার হাত থেকে নিয়ে বল্লেন—"এ কথাও বুঝিয়ে দিতে হবে······"

আমি একটু অভিমান করে বল্লাম,—"আমার বুদ্ধি তেমন ধারাল নয়ত।"

মামাবাবু কৌতুকের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "না রে সে কথা বলছি না, কিন্তু এই ছুরি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের চীনে-চালক বাঘের আক্রমণে মারা যায় নি, মারা গেছে ছুরির আঘাতে। আর ছুরি কোন জানোয়ার চালায় !"

আমি বল্লাম,—“কিছু মনে করবেন না, আমার বুদ্ধি কম বলেই অন্য নানা কথা আমার মনে হচ্ছে।”

“কি মনে হচ্ছে আবার?” মামাবাবু একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বল্লেন।

“ছুরিটা যে একমাত্র মানুষই চালাতে পারে, সেটুকু বুঝতে পারছি, কিন্তু ছুরিটা যদি সত্যি ব্যবহার হয়ে থাকে, তা হলে কখন হয়েছে এবং কার দ্বারা হয়েছে তার কিছু হদিস্ কি পাওয়া যাচ্ছে এটা থেকে?”

মামাবাবু অবাক হয়ে বল্লেন,—“তার মানে?”

বল্লাম—“তার মানেও কি বুঝিয়ে দিতে হবে?” বলবার পর এবার—দুজনেই হেসে ফেল্লাম।

মামাবাবু এবার বল্লেন,—“তাহলে তুই কি বলতে চাস?”

“বেশী কিছু নয়, শুধু এই যে, ছুরিটা হয়ত প্রথম আক্রমণের পরেও ব্যবহার হতে পারে কিম্বা আসল হত্যাকারীর এটা একটা চাল, আমাদের সন্দেহকে ঘুলিয়ে দিয়ে ভুল পথে চালাবার জন্যে।”

আমার দিকে খানিকক্ষণ গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে থেকে মামাবাবু বল্লেন,—“আমার তা মনে হয় না।”

কিন্তু আমার তাই মনে হয়। তবু আমার সন্দেহের সব কথা মামাবাবুর কাছে প্রকাশ করবার সময় হয়নি বলে, আমি তখনকার মত চুপ করে গেলাম।

সেদিন সত্যই সন্ধ্যের আগে আমরা জঙ্গল পার হতে পারলাম না। অন্ধকার নেমে এল তার আগেই। ঘন জঙ্গলের ভেতর তাঁবু ফেলা অসম্ভব ব্যাপার। কোন রকমে গাছ লতা পাতা কেটে আমাদের তাঁবুটুকু ফেলবার ব্যবস্থা হ'ল। আর সকলকেই আগুন জ্বালিয়ে বাইরে রাত কাটাবার বন্দোবস্ত করতে হল। লি-সিন আর তার দল আজকে আমাদের তাঁবুর কাছাকাছিই রইল। এদের কষ্টসহিষ্ণুতা দেখে সত্যি অবাক হতে হয়। তাদের সঙ্গীর মৃতদেহের সৎকার করে জঙ্গলের ভাপ্‌সা স্যাঁতসেঁতে মাটিতে তারা কোন রকম আগুন টাগুন না নিয়েই শুধু কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। জঙ্গলের হিংস্র শ্বাপদ সম্বন্ধেও তাদের ভয় ডর যেন নেই।

পথে বেরিয়ে এ কয়দিন কোন বিশেষ অস্বস্তি ভোগ করিনি। কষ্ট বা অসুবিধাতে খুব কাতর হওয়া আমার স্বভাবও নয়। কিন্তু আজ এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভেতর তাঁবুর মাঝেও কেমন যেন অসোয়াস্তি অনুভব করছিলাম। এ ধরণের অরণ্য-বাসের অভিজ্ঞতা আমার নেই। অরণ্য সম্বন্ধে আমার সাধারণ যে কল্পনা ছিল তার সঙ্গে কিছুই এর মেলেনা। বিছানা পাততে গিয়ে প্রথমেই ত গোটা দুই বড় বড় কাঁকড়া বিছে তাঁবুর ভেতর আবিষ্কার করে মনটা খিচড়ে গেল। আলো জ্বেলেও বেশীক্ষণ বসতে পারলাম না। জঙ্গলের অসংখ্য বিদঘুটে চেহারার পোকা সে আলোর নিমন্ত্রণে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান করলে। এমন

আলো তাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের জীবনে তারা নিশ্চয় দেখেনি। সে পোকামাকড়ের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়ে আলো নিভিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেন হিংস্র বন্যার মত এসে চারিদিক থেকে আমাদের চেপে ধরল। সে অন্ধকার নয় যেন শক্ত কালো পাথরের দেওয়াল। আমাদের পিষে ফেলবার জন্য উদ্গ্রীব। হাত দিলেই সে অন্ধকার যেন ছোঁয়া যাবে মনে হয়। তারপর জঙ্গলের অদ্ভূত শব্দময় নিস্তব্ধতা। আগাগোড়া একটা হট্টগোলের ভেতর থাকা যায়, কিন্তু এই যে জঙ্গলের পরিপূর্ণ নিঃশব্দতা থেকে থেকে অজানা কোন জানোয়ারের আর্ত্তনাদে বা কোন নিশাচর শ্বাপদের আস্ফালনের শব্দে হঠাৎ যেন কাঁচের বড় আয়নার মত ঝন ঝন করে ভেঙ্গে যাচ্ছে, —মনের সঙ্গে সমস্ত দেহের স্নায়ুও এতে অবশ হয়ে যায়। এ জঙ্গল কল্পনার জিনিষ নয়, এ একেবারে মানুষের জীবন্ত শত্রু। বিশাল গাছগুলো যেন স্থানু নয়, বিরাটকায় দৈত্যদের বাহিনীর মত তারা যেন মানুষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে; সারি সারি কাঁটার ঝোপে, অসংখ্য তার ফাঁদ পাতা, অগণন তার অস্ত্র আর উপকরণ।

মামাবাবুর কিন্তু কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই। মিচিনার পাকা বাড়িতেই যেন শুয়েছেন এমনি ভাবে তিনি বিছানায় পড়েই নাক ডাকাতে স্বরু করলেন। আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। কেবলই মনে হতে লাগল বিছানার ভেতর কোথায় যেন

কাঁকড়া বিছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন বাইরে কোন জানোয়ারের নিঃশব্দ সঞ্চরণ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হ'ল দূরে যেন কোন মানুষই অর্ত্তনাদ করে উঠল, তাঁবুর দরজার পর্দ্দা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে মঙ্পো আর আমাদের কাচীন চাকর যেখানে আগুন জ্বালিয়ে শুয়েছিল সেখানে একবার চেয়ে দেখলাম। কোথাও কিছু গোলমাল নেই, গণগণে না হলেও তাদের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। তারা বেশ সুখে আছে বলে অবশ্য মনে হ'ল না। আগুনের রক্তাভ আলোয় মনে হ'ল তাদের কম্বল প্রায়ই নড়ছে।

এ আলো দেখে কিন্তু বিশেষ ভরসা পেলাম না! বিছানাটা অন্ধকারেই একবার ঝেড়ে নিয়ে আবার এসে শুয়ে অবশ্য পড়তে হ'ল। খানিক বাদে অনেক কষ্টে একটু তন্দ্রাও এল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম বলতে পারি না। হঠাৎ আচমকা কি রকম একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্ন দেখছিলাম কি না বলতে পারি না কিন্তু মনে হ'ল কে যেন এইমাত্র তাঁবুর দরজার পর্দ্দা সরিয়ে বেরিয়ে গেল। স্পষ্ট যেন শুনলাম তাঁবুর পর্দ্দা নড়ার আওয়াজ। তাড়াতাড়ি উঠে পর্দ্দার কাছে গেলাম। সেটা তখনও নড়ছে। কিন্তু হাওয়ায় হওয়াও সম্ভব। বাইরে সত্যিই বেশ জোরে কনকনে হাওয়া দিয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে কি করব ভাবছি এমন সময় কাছেই পায়ের আওয়াজ শুনলাম। পর্দ্দার ভেতর দিয়ে শুধু মুখটুকু বাড়িয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে রইলাম। মংপোদের আগুন প্রায় নিভে এসেছে, তারা ঘুমে অচেতন।

কে আর আগুনে মশলা জোগাবে। কিন্তু সেই নিভু নিভু আলোতেই আমার কাজ হয়ে গেল। যার পায়ের শব্দ শুনে-ছিলাম সে সেই আগুনের পাশ দিয়েই কোথায় দ্রুত বেগে চলেছে দেখা গেল। আর সমস্ত অন্ধকার হলেও শুধু তার পায়ের বিশেষ ধরণের জুতো দেখেই আমি তাকে চিনলাম। লি-সিন ছাড়া এ ধরণের জুতো আমাদের দলের কারুর নেই।

এই নিশুতি রাত্রে এমন সময় লি-সিন চলে'ছ কোথায়?

তাঁবুতে আমরা সাজ পোষাক সমেত যে শুয়েছিলাম একথা বলাই বাহুল্য। কোমরবন্ধে পিস্তলও ছিল, শুধু বিছানা থেকে টর্চ্চ-টা তুলে নিয়ে আমি আর দ্বিধামাত্র না করে তাকে অনুসরণ করলাম।

অনুসরণ করা বেশ কঠিন। একে দারুণ অন্ধকার তায় জঙ্গলের পথ, প্রত্যেক পদে নানান লতা পাতার বাধা। নীচের শুকনো পাতা মড় মড় করে উঠলেই মনে হয় বুঝি সব জানা-জানি হয়ে গেল। কিন্তু সে ভয় যে অমূলক অল্পক্ষণেই তা বুঝতে পারলাম। যাকে অনুসরণ করছি তার কাছেও নিজের পায়ের শব্দে ও জঞ্জালের খসখসানিতেই অন্য শব্দ ঢাকা পড়ে যাবে। শুধু বেশী এগিয়ে বা পিছিয়ে পড়লে চলবে না। অন্ধ-কারে লোকটাকে হারিয়ে ফেলা অত্যন্ত সহজ।

এ ভাবে অনুসরণ করার বিপদ যে কতখানি তা যে না বুঝিনি তা নয়। সাপখোপ ও হিংস্র শ্বাপদের ভয়ত আছেই তা ছাড়া

শত্রুর কবলে পড়ার সম্ভাবনাও কম নয়। লি-সিন কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছে কিছুই জানিনা। সেখানে গিয়ে নূতন কিছু আবিষ্কার করার বদলে হয়ত নিজেই আবিস্কৃত হয়ে বিপন্ন হতে পারি, কিন্তু তবু এ অনুসরণ ত্যাগ করতে পারলাম না। মনে হ'ল বিপদ যতই থাক, আমাদের চারিধারে যে রহস্য ঘিরে রয়েছে তার মীমাংসার সূত্র খুঁজে পাবার এমন সুযোগ আর মিলবে না।

কোথা দিয়ে কোন দিকে যে যাচ্ছিলাম কিছুই জানি না। যাকে অনুসরণ করছি সেই আমার একমাত্র পথ-প্রদর্শক। ফিরে আসব কি করে, যদি সে ভাগ্য হয়, তাও তখন খেয়াল নেই। শুধু এক লক্ষ্য নিয়ে চলেছিলাম।

কিন্তু তাতেও বাধা পড়ল। অনেকক্ষণ বনের ভেতর দিয়ে কাঁটা গাছের ডালের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যেতে যেতে সহসা এক জায়গায় আমাদের দুজনার মাঝখান দিয়ে কি একটা বিশাল জানোয়ার সশব্দে জঙ্গল ভেঙে ছুটে বেরিয়ে গেল। চমকে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। তারপরে এগুতে গিয়ে দেখি লি-সিনকে হারিয়ে ফেলেছি। সে এর মধ্যে কোন দিকে গেছে কিছুই বুঝতে পারলাম না। একটুখানি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তার পায়ের শব্দ শোনবার চেষ্টা করলাম। মনে হ'ল যেন দূরে পায়ের চাপে পাতা গুঁড়িয়ে যাবার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তাকে অনুসরণ করা শক্ত। নিজের পায়ের আওয়াজে সব শব্দ ঢেকে যায়।

এবার আমি সত্যি ভয় পেলাম। অনুসরণ ব্যর্থ ত হ'লই, তা ছাড়া আমার ফেরবার পথও যে বন্ধ। সকাল হওয়া পর্য্যন্ত বেঁচে থাকলেও আমি কি পথ খুঁজে যেতে পারব? মামাবাবু তাঁর লোকজন নিয়েই কি আমায় খুঁজে পাবেন? জঙ্গলে এইভাবে পথ হারিয়ে কত লোক এমনিভাবে মারা পড়েছে আমি শুনেছি। জঙ্গলের যাদু এমনি যে, সেখানে পথ হারিয়ে বেরুবার চেষ্টা করলে মানুষ কেবল ঘুরে ঘুরে যেখান থেকে যাত্রা করেছিল সেখানেই ফিরে আসে এবং শেষে একেবারে ক্লান্ত হয়ে মারা যায়।

কিন্তু না, এসব কথা ভাবলে চলবে না, আমার যেমন করে হোক বেরুতেই হবে। আর একবার কান পেতে আমি পায়ের শব্দ শোনবার চেষ্টা করলাম এবং একটুখানি আভাস পাওয়া মাত্র আর ধরা পড়বার ভয় ভুলে প্রাণপণে সেদিকে দৌড়ে গেলাম খানিক। সেখান থেকেও অমনি ভাবে একটু থেমে পায়ের আভাস পেয়ে আবার দৌড়াতে লাগলাম সেই দিকে। দৌড়োতে দৌড়োতে একটা জিনিষ বুঝতে পারছিলাম। যে দিকেই এসে থাকি, জঙ্গল যেন অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে মনে হচ্ছিল। পদে পদে সে রকম বাধা আর নেই। বড় বড় গাছও অনেক দূরে দূরে।

বেশীদূর এমন করে দৌড়োতে হ'ল না। সমস্ত জঙ্গল আচমকা কেঁপে উঠল বাঘের গর্জ্জনে। গর্জ্জন খুব কাছে।

কিন্তু আমি টর্চ্চের আলোটা জ্বালাবার আগেই অন্য এক দিক থেকে আরেকটা টর্চ্চের আলো সেখানে এসে পড়ল অন্ধকার চিরে। সে আলোয় দেখা গেল দীর্ঘকায় এক চীনেম্যান হাতে একটা শিঙার মত জিনিষ নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

টর্চ্চের আলো পড়ার পরও সেই শিঙা মুখে তুলে সে একবার ফূঁ দিলে,—বেরিয়ে এল এক ভয়ঙ্কর বাঘের গর্জ্জন।

ওদিক থেকে যে টর্চ্চ ফেলেছিল সে লোকটা এবার এগিয়ে এল। দুজনের উপর আলো ফেলেই আমি চমকে উঠলাম। নতুন লোকটি আর কেউ নয়—মামাবাবু!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমার টর্চের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মামাবাবু ও সেই চীনেম্যান দুজনেই চমকে ফিরে তাকিয়েছিল। আমি এগিয়ে তাদের কাছে যাবার পর মামাবাবু একবার শুধু বিস্মিতভাবে অস্ফুটস্বরে বল্লেন—"তুই ?" তারপরে আমাকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়ে চীনেম্যানের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন ইংরাজীতে—"কে তুমি ?"

মামাবাবুর এক হাতে ছিল টর্চ ; কিন্তু আরেক হাতে যে জিনিষটি ছিল তাকে ভয় না হোক সম্মান না করা কঠিন।

কিন্তু সেই রিভলভারের নিঃশব্দ হুমকি বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে অত্যন্ত সহজভাবে দীর্ঘাকার চীনেম্যান পরিষ্কার ইংরাজীতে উত্তর দিলে—"সেই প্রশ্ন আমিও আপনাদের করতে যাচ্ছিলুম।"

মামাবাবু কঠিন স্বরে বল্লেন,—"তামাসা রাখ, এখানে তুমি কি করছ ?"

চীনেম্যান একটু হেসে বল্লে,—"স্থান কাল বিচার করে ঠিক আপনি কথা বলছেন বলে মনে হচ্ছে না।"

"মিছিমিছি কথা বাড়াবার আগ্রহ আমার নেই।" মামাবাবু আরো রূঢ়ভাবে বল্লেন, "তোমার পরিচয় ও এখানে উপস্থিতির কারণ আমি জানতে চাই।"

"কৌতূহল জিনিষটা শুধু আপনার একচেটিয়া মনে করছেন কেন ? তাছাড়া এক রকম আমারই ঘরে বসে আমায় চোখ রাঙান কি ভালো !"

"তোমারই ঘরে বসে ! তার মানে ?"

এবার চীনেম্যান মুখে উত্তর না দিয়ে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার টর্চ্চটা ধরে অপর দিকে ঘুরিয়ে দিলে। নতুন দিকে আলো পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চমকে উঠলাম। এতক্ষণ অন্ধকারে এ জিনিষটি আমরা দেখতেই পাইনি।

কাছেই বনের ভিতর একটা বড় তাঁবু ফেলা রয়েছে।

বিস্ময় সাম্‌লে ওঠ্‌বার আগেই দীর্ঘকার চীনেম্যান বল্লে,— "অসময়ে অস্থানে হলেও এ গরীবের তাঁবুতে দয়া করে পা দিলে অতিথি-সৎকারের একটু চেষ্টা কর্‌তে পারি।"

এবার আমি শুধু নয় মামাবাবুও বোধ হয় বেশ একটু ভড়কে গিয়েছিলেন। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন আজগুবি, তা'ছাড়া এমন জায়গায় কোন অজানা তাঁবু যে থাক্‌তে পারে তা আমরা কল্পনাও করিনি। মামাবাবু একটু যেন অপ্রস্তুত ভাবেই চুপ করেছিলেন।

চীনেম্যান আবার বল্লে,—"পরস্পরের আলাপ পরিচয় ওখানে গিয়েই ভালো করে হতে পারে। আপনারা অনেক কিছু প্রশ্ন করেছেন, আমারও হয়ত কিছু জানবার আছে !

মামাবাবু এতক্ষণে স্থির হয়ে বল্লেন,—"কিন্তু এ সময়ে

আপনার তাঁবুর বাইরে আসবার কারণ কি ? এ অদ্ভুত শিঙা বাজাবারই বা কি অর্থ ?”

চীনেম্যান আবার হেসে বল্লে,—“সেটুকু আগে না জান্‌লে আপনাদের অপরিচিত তাঁবুতে হঠাৎ ঢুক্‌তে সাহস হচ্ছে না কেমন ?”

“জঙ্গলে এই রাত্রে যারা এতদূর আস্‌তে পেরেছে তাদের, আর যাই হোক্ সাহসের অভাব আছে এ কথা বোধ হয় বলা চলে না।”—আমি বল্লাম।

চীনেম্যান বল্লে,—“তা বটে! তাহলে কৈফিয়ৎটাই দিচ্ছি—শুনুন। কিন্তু এই মাত্র এই অদ্ভুত শিঙাটি আমি কুড়িয়ে পেয়েছি বল্লে কি বিশ্বাস কর্‌তে পারবেন ?”

“কুড়িয়ে পেয়েছেন ?”

“হ্যাঁ, কুড়িয়ে পেয়েছি। আপনারা ভাবছেন নিশ্চয়, যে এই অন্ধকার রাত্রে তাঁবু ছেড়ে শিঙা কুড়োতে বেরোনটা একটু অস্বাভাবিক। আমি সত্যি সেই জন্যেই অবশ্য তাঁবু থেকে এমন সময়ে বার হইনি। বার হয়েছিলাম চোর তাড়া কর্‌তে।”

একটু চুপ করে থেকে আমাদের বিস্ময়টাকে বেশ যেন মজা করে উপভোগ করে চীনেম্যান বল্লে আবার—“শুন্‌লে অবাক্ হবেন যে এই জঙ্গলের মাঝেও আমার তাঁবুতে খানিক আগে চোর ঢুকেছিল। আমি জেগে থাকায় সুবিধে কর্‌তে পারেনি অবশ্য। তাকে তাড়া কর্‌তে বেরিয়েই এটি পেয়েছি। লোকটা

কোন কিছু অস্ত্রের অভাবেই বোধ হয় এটা মেরে আমায় জখম কর্‌তে চেয়েছিল। যাই হোক্ চোর ধরতে না পেরে তার জিনিষটার গুণ পরীক্ষা কর্‌ছি এমন সময় আপনারা দেখা নিলেন আশ্চর্য্যভাবে।"

মামাবাবু গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"আপনি এ রকম শিঙার আওয়াজ আগে কখন শুনেছেন?"

চীনেম্যান একটু থেমে অবাক হয়ে বল্লে,—"আশ্চর্য্যের বিষয় আপনি জিজ্ঞাসা করাতেই এখন মনে পড়ছে যে শুনেছি শুধু নয়, এ রকম আওয়াজে এই কদিন ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু এটা যে সামান্য শিঙার আওয়াজ হতে পারে তা কখনও ভাবিনি। যাই হোক্ অনেক কিছু রহস্য আমাদের মীমাংসা কর্‌বার আছে মনে হচ্ছে। অনুগ্রহ করে আমার তাঁবুতে যদি আসেন তাহলে ভাল করে একটু আলাপ করতে পারি।"

মামাবাবু কি ভেবে এবার বল্লেন—"চলুন।"

তার তাঁবুতে গিয়ে খানিকক্ষণ পরস্পরের পরিচয় দেওয়া নেওয়ার পর অনেক নতুন কথা জান্‌তে পারলেও কোন রহস্যই সরল হ'ল না। এই চীনেম্যান সম্বন্ধে আমরা আগেই যা অনুমান করেছিলাম, তার অধিকাংশ সত্য বলে জানা গেল। কিছুদিন আগে সেই যে বিস্তর দলবল নিয়ে মিচিনা থেকে বেরিয়েছিল একথা সে নিজে থেকেই জানালে। এ পথে তার যাত্রা করবার কারণও পাওয়া গেল। সে চীনের দক্ষিন-পূর্ব্ব

সীমান্ত প্রদেশ ইউনানের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তার নাম লাওচেন। সেখানে সে নাকি বিশেষ বিখ্যাত। বৎসর খানেক আগে বিশেষ কোন কারণে সেখানকার শাসন-কর্ত্তার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। এখন আবার গোপনে এই পথে সে দেশে ঢুকতে চেষ্টা করছে।

দুঃখের বিষয় যে রহস্যের কিনারা আমরা করতে চাইছিলাম তার সঙ্গে এ সমস্ত খবরের কিন্তু কোন সংশ্রবই নেই। বরং না জেনে এই চীনাদলের সঙ্গে আমাদের গত কয়েকদিনের ঘটনার যে যোগ আছে বলে আমরা কল্পনা করেছিলাম—এ সমস্ত খবর শুনে সে বিষয়ে সন্দেহই উপস্থিত হ'ল। তার কথায় জানলাম জঙ্গলের পথে তাদের দলের ওপরও বাঘের বহু উপদ্রব হয়েছে।

লাওচেনের কাছে সব চেয়ে বিস্ময়কর খবর কিন্তু পাওয়া গেল শেষে। তার ওপর যেটুকু অবিশ্বাস ছিল এই খবরের পর সেটুকুও দূর হয়ে তার জন্য রীতিমত দুঃখই হ'ল। তার তাঁবুতে যখন ঢুকেছিলাম তখন অন্ধকারে বাইরের বেশী কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন বেরুলাম তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে।

লাওচেন আমাদের এগিয়ে দেবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। আমরা যে সামান্য পোকা-মাকড়ের খোঁজে এই বিপদসঙ্কুল দেশে এসেছি এ কথা তাকে তখনও ভালো করে

বিশ্বাস করাতে পারা যায় নি। সে তখনও বিস্মিতভাবে সেই সম্বন্ধেই নানা কথা জিজ্ঞাসা করছিল।

হঠাৎ মামা-বাবু বল্লেন—"আশ্চর্য্য! আর সব লোকজন আপনার কোথায়? আপনার ত মস্ত বড় দল! তাদের কাউকে ত দেখছি না।"

লাওচেন খানিক চুপ করে থেকে হঠাৎ কাতরভাবে বল্লে—"আপনাদের এ কথাটা জানাতে চাইনি। এবারে আমার দেশে যাওয়া আর হ'ল না।"

"কেন বলুন ত?"

"আমার অধিকাংশ লোকজন এই গত কালই আমায় ছেড়ে চলে গেছে। কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর ছাড়া আর কেউ আমার সঙ্গে নেই। কাল রাত্রে আমার তাঁবুতে চোর আসতে সাহসও বোধ হয় করেছিল তাই।"

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"হঠাৎ এ রকম ছেড়ে যাওয়ার কারণ!"

"কারণ যে কি তা ঠিক আমিও বুঝতে পারছি না। তবে তারা যে বিশেষ একটা কিছুর ভয় পেয়ে সরে গেছে এটা ঠিক। তাদের ইউনান পর্য্যন্ত যাবার কথা, কিন্তু এই পর্য্যন্ত এসে আর তারা কিছুতে এগুতে রাজী হ'ল না। মাইনে বখ্‌শিষ সব কিছুর লোভ দেখিয়েও তাদের রাখতে পারলাম না। আপনারা সাবধান থাকবেন, শেষ পর্য্যন্ত আপনাদের দলে না এমনি কিছু হয়।"

"এখনও পর্য্যন্ত ত হয়নি। কিন্তু ভয়টা কিসের মনে করেন?"

"লাওচেন বল্লে,—"শুধু বাঘের উপদ্রব নয়। উত্তরের জঙ্গলে 'দারুরা' ক্ষেপে গিয়ে বিষের তীর ছুড়ে সকলকে মেরে ফেলছে এমনি এক গুজব নাকি রটেছে।" তার কথার ধরণে কিন্তু মনে হ'ল যে এই গুজবই সব নয়। এ ছাড়া বিশেষ কোন একটা কথা সে চেপে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লাওচেনের কাছে বিদায় নিয়ে জঙ্গলের পথে নিজেদের তাঁবুর দিকে যেতে যেতে মামাবাবুর সঙ্গে প্রথম ভালো করে সব কথা আলোচনা করবার সময় পেলাম। প্রথমে মামাবাবুর প্রশ্নের উত্তরে কি জন্যে কি ভাবে আমি এই অন্ধকার রাত্রে জঙ্গলের মাঝে বেরিয়ে পড়েছিলাম তার কাহিনী বলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু আপনি কি করে এলেন এখানে ?"

মামাবাবু বল্লেন, "আমাদের তাঁবু থেকে যে লোকটা রাত্রে বেরিয়ে যাওয়ায় তোর ঘুম ভেঙ্গে গেছল, সে লোকটা কে বল দেখি ?"

"বুঝতে পারছি না।"

মামাবাবু এবার হেসে বললেন—"সে আমিই।"

"আপনিই ! আপনি কি জন্যে অত রাত্রে বেরিয়েছিলেন, লি-সিনের ওপর তাহ'লে আপনারও লক্ষ্য ছিল বলুন।"

"না লি-সিনকে আমি দেখি-ই নি। এখন তোর কথায় বুঝতে পারছি, আমি যার পিছু নিয়েছিলাম, লি-সিনের লক্ষ্যও ছিল সেই।"

"সে আবার কে ? আমি-ত দেখিনি কাউকে !"

"তুমি কি করে দেখবি ? তুই লি-সিনকেই অনুসরণ

করেছিস। সে যার পিছু নিয়েছিল তাকে দেখতে পাবার তোর কথা নয়।”

আমি বিস্মিত হয়ে খানিক চুপ করেছিলাম। মামাবাবু আবার বল্লেন,—“ব্যাপারটা অত্যন্ত ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে। লি-সিন আর আমি দুজনেই একই লোককে অনুসরণ করেও পরস্পরকে দেখতে পাইনি, তুই আবার লি-সিনেরই পিছু নিয়েছিলি।”

“কিন্তু তোমরা যাকে অনুসরণ করেছিলে সে কি আমাদেরই দলের কেউ ?”

“তাইত আমার বিশ্বাস।”

“সে কে হতে পারে ?”

মামাবাবু বল্লেন,—“তা এখন বলতে পারব না—কিন্তু এই কয়দিনের সমস্ত রহস্যের মূলে সে যে কতকটা আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে শিঙ্গা থেকে বাঘের ডাক বেরোয় সেটা তারই কাছে ছিল।”

“তার মানে আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে সে লাওচেনের তাঁবুতেও চুরি করতে ঢুকেছিল ?”

মামাবাবু একটু হেসে বল্লেন—“সেই রকমই ত দেখা যাচ্ছে !”

সমস্ত ব্যাপারটা গুছিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে আবার জিজ্ঞাসা করলাম—“কিন্তু অত রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে তুমি তার সাড়া পেলে কি করে ?”

আমায় একেবারে অবাক করে দিয়ে মামাবাবু বল্লেন—"আমি ঘুমোই নি। তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম শুয়ে শুয়ে।"

"তার মানে তুমি আগে থাকতেই জানতে সে যাবে! তাহলে তাকে ধরবার বন্দোবস্ত করো নি কেন ?"

"তাহলে তার গন্তব্য স্থান জানতে পারতাম না।"

"কিন্তু জানতে ত আমরা কিছুই পারলাম না। সে ত লাওচেনের তাঁবু থেকেও পালিয়ে গেল।"

মামাবাবু এবার গম্ভীর হয়ে শুধু বল্লেন—"তা বটে!" তারপর খানিক নীরবে চলার পর আবার বল্লেন, "দেখা যাক লি-সিন কি খবর দেয়।"

কিন্তু লি-সিনের কাছে কোন খবর পাবার আশা আমার ছিল না। মামাবাবু যাই বলুন, লি-সিনের গতিবিধির আমি অন্য রকম ব্যাখ্যাই করেছিলাম এবং সে ব্যাখ্যা যে ভুল নয় ঘটনার দ্বারা খানিকটা প্রমাণও হয়ে গেল।

নিজেদের তাঁবুতে গিয়ে কি দেখব সে বিষয়ে আমার একটু ভয়ই ছিল। লাওচেনের লোকদের মত আমাদের বাহকেরাও আমাদের ফেলে সরে পড়তে পারে হয়ত।

কিন্তু তাঁবুতে পৌঁছে দেখা গেল—সে রকম কোন ব্যাপার ঘটেনি। খোজ নিয়ে জানা গেল আমাদের অনুচরদের সকলেই উপস্থিত। শুধু এক লি-সিন ছাড়া।

লি-সিন সম্বন্ধে মামাবাবুর গভীর বিশ্বাসে একটু খোঁচা না

দিয়ে পারলাম না এবার,—"আপনার লি-সিনের ত পাত্তা নেই, মামাবাবু! চোর না ধরে বোধ হয় ফিরবেনা মনে হচ্ছে!"

মামাবাবু আমার দিকে অদ্ভূত ভাবে তাকিয়ে বল্লেন, "তোর কি এখনও লি-সিনের ওপর সন্দেহ গেল না?"

একটু অপ্রসন্ন ভাবেই বল্লাম—"কেমন করে যাবে তা ত বুঝতে পারছিনা। আর সকলেই ত উপস্থিত, শুধু লি-সিনকেই পাওয়া যাচ্ছে না এর মানে কি? আমাদের দলের যে সাংঘাতিক লোককে কাল অনুসরণ করেছিলে বলছ সেও ত বোঝা যাচ্ছে কোন রকমে দলে ফিরে এসেছে!"

মামাবাবু একথা ভেবেছিলেন কিনা বলা যায় না কিন্তু তিনি উত্তর না দিয়ে গম্ভীর ভাবে চুপ করে রইলেন।

আমি আবার অসহিষ্ণুভাবে বল্লাম,—"আমাদের ভেতর অমন ভয়ানক লোক কে আছে তাও ত খুঁজে বার করা দরকার। ঘরের ভেতর বিষাক্ত সাপ নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকাও ত উচিত নয়।"

এবার মামাবাবু যা উত্তর দিলেন তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না! মনে হ'ল কদিনের ঘটনা-বিপর্য্যয়ে তাঁর মাথাই একটু খারাপ হয়েছে। তিনি বল্লেন,—"ভাবনা নেই! সাপ কোথায় আছে জানলে যথাসময়ে মারা যাবে। তাছাড়া এখন আমাদের কিছুদিন আর কোন ভয় নেই।"

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কেন বল দেখি?"

"আমার তাই মনে হচ্ছে।"

মামাবাবুর পাগলামিতে বিরক্ত হয়েই আমি এবার চুপ করে গেলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মামাবাবুর কথা কিন্তু এবার আশ্চর্য্যভাবে ফলল। এতদিন যে বিপদ আমাদের অনুসরণ করে আসছিল যাদুমন্ত্রে তা যেন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল! হার্টজ্ কেল্লা পর্য্যন্ত পাহাড়ের পথে আমাদের সামান্য একটু আধটু জঙ্গলের অসুবিধা ছাড়া আর কিছুই ভোগ করতে হ'ল না। আশ্চর্য্যের বিষয় লি-সিনের সেই রাত্রের পর আর পাত্তা পাওয়া যায় নি। না পাওয়াতে আমি বিশেষ দুঃখিত সত্যি হইনি। আমার ধারণা, সে সময় বুঝে এবার নিজের পথ দেখেছিল। ভেবেছিলাম মামাবাবু খুব বিচলিত হবেন। আমার কথায় লি-সিন সম্বন্ধে বিশ্বাস তাঁর একটু শিথিল হয়েছিল সম্ভবতঃ। কিন্তু তাঁকে তেমন কিছু ব্যাকুল দেখা গেল না। তা ছাড়া সম্প্রতি পথে লাওচেনের সঙ্গ পেয়ে দিনগুলো ভালোই কাটছিল। লাওচেনের আমাদের সঙ্গে এসে মেলা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা যেতে পারে। তার সঙ্গে পরিচয় হবার দিনই সে নিজে আবার দেখা করতে আসে আমাদের সঙ্গে এবং জানায় যে আমরা তাকে একটু সাহায্য করলে সে এখনও নিজের দেশ 'ইউনানে' গিয়ে উঠতে পারে। তার লোক লস্কর নেই; সামান্য কয়েকজন অনুচর নিয়ে এই বিপদসঙ্কুল পথে যাবার ভরসা তার হয় না। আমাদের সঙ্গে যাবার অনুমতি পেলে তার অনেক সুবিধে হয়ে যায়।

মামাবাবু বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তৎক্ষণাৎ তাকে আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিলেন "আপনি আসবেন ভেবে আমি আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়েছিলাম।" লাওচেন একটু অবাক হলেও হেসে বলেছিল,—"আপনার আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ।" লাওচেন সেই থেকে আমাদের সঙ্গেই আছে। এবারের যাত্রা লাওচেন থাকার দরুণই অনেকটা সহজ হয়েছিল। এদিকের পথ-ঘাট তার বেশ জানা। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তারই পরামর্শ মত চলে আমাদের অনেক সুবিধে হয়েছে। লাওচেনের লোক লস্কর যে মিছিমিছিই একটা ভয়ের ছুতো করে তাকে ছেড়ে গেছে এ বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস ক্রমশঃই দৃঢ় হচ্ছিল। পথে কোন গোলমালের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। হার্টজ্ কেল্লার কাছাকাছি যখন পৌঁছোলাম তখন কয়েকদিন পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার মধ্যে কাটিয়ে গোড়ার দিকের ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলোও আমাদের কাছে যেন অবাস্তব হয়ে গেছে।

কে জানত সেই দিনই আবার নতুন করে তাদের সূত্রপাত হবে।

কাচিন পাহাড়ের উঁচু-নীচু জঙ্গলময় আঁকাবাঁকা পথে ঘোরার পর হার্টজ কেল্লার প্রথম দেখা পেয়ে মনে আপনা থেকেই যেন শান্তি আসে। চারি দিকের সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণীর মাঝখানে সমতল বিশাল উপত্যকায় কেল্লাটি অবস্থিত। সেখানে শস্যশ্যামল প্রান্তরের মাঝে কৃষকদের পরিচ্ছন্ন গ্রামগুলি দেখা যাচ্ছে। বৌদ্ধ

পাগোডার চূড়া উঠেছে এখানে সেখানে। এখানকার অধিবাসীরা কাচিন নয় 'শান' জাতি। তারা এককালে যোদ্ধা হিসেবে এ দেশ জয় কর্‌লেও এখন অকর্ম্মণ্য অলস হয়ে গেছে। কাচিনরাই এখন তাদের ওপর উৎপাত করে।

এই হার্টজ কেল্লার পরই 'দারু'দের অজানা দেশে প্রবেশ করতে হবে। সেখানে পাহাড় ও জঙ্গলের মাঝে অশ্বতর বাহিনী পর্য্যন্ত চলতে পারে না। পায়ে হেঁটে কুলির মাথায় মোট নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। পাহাড় থেকে হার্টজ কেল্লার সমতল প্রান্তরে নামবার আগের দিন সন্ধ্যায় আমাদের তাঁবুতে সেই নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। লাওচেনের তাঁবুতেই আমরা সকলে বসেছিলাম। এ কয়দিন আমাদের দুজনদের তাঁবু কাছাকাছিই ফেলা হচ্ছে। কুলি সংগ্রহ ও পথঘাট সম্বন্ধে একঘেয়ে আলোচনা কতক্ষণ সহ্য করা যায়। খানিক বাদে আমি উঠে পড়লাম। পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের সমতল প্রান্তরের দৃশ্যটি সন্ধ্যার আলোয় আর একবার দেখতে ইচ্ছে করছিল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের ধারে সেই জন্যেই যাবার উদ্যোগ করছি এমন সময়ে আমাদের তাঁবুর দিকে চোখ পড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কে একটা লোক সন্তর্পণে আমাদের তাঁবুতে ঢুকছে। আমার দিকে পেছন ফিরে থাকলেও সে যে মঙপো বা আমাদের কাচিন চাকর নয় তা বুঝতে আমার কষ্ট হল না। আমাদের অশ্বতর চালকদের কেউও সে নয়। তার পোষাক পর্য্যন্ত আলাদা।

প্রথমে আমার ইচ্ছে হয়েছিল তৎক্ষণাৎ মামাবাবু ও লাণ্ডচেনকে ডাকতে। কিন্তু তার পরে মনে হ'ল লোকটার উদ্দেশ্যটা আগে গোপনে জানা দরকার। পা টিপেটিপে আমি আমাদের তাঁবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। লোকটা তখন ভেতরে ঢুকেছে। একটুখানি অপেক্ষা করে আমি হঠাৎ তাঁবুর পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে বল্লাম—"কে তুমি?" কিন্তু আর অগ্রসর হতে আমায় হ'ল না। তাঁবুর ভেতর তখন আলো জ্বালা হয় নি। বাইরের তুলনায় সেখানে বেশ অন্ধকার। ভালো করে কিছু দেখতে পাবার আগেই প্রচণ্ড এক ধাক্কায় আমি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম। মামাবাবুর ক্যাম্প খাটের কোণে সজোরে আমার মাথাটা ঠুকে গেল। লোকটা তখন ছুটে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

মাটি থেকে উঠে আমিও তার পেছু নেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মাথায় চোটটা একটু বেশীই লেগেছিল। তাঁবু থেকে বেরোতেই মনে হ'ল সমস্ত পা টলছে, মাথা ঝিম ঝিম করছে। লোকটা আমার চোখের সামনেই তখন দ্রুতবেগে পাহাড়ের প্রান্তে যেখানে পথ নেমে গিয়েছে সেই দিকে দৌড়োচ্ছিল। এ অবস্থায় তাকে ধরা অসম্ভব জেনে আমি চীৎকার করে মামাবাবুকে ডাকলাম।

লাণ্ডচেন ও মামাবাবু একসঙ্গেই বেরিয়ে এলেন ব্যস্ত হয়ে তাঁবু থেকে। কিন্তু তখন লোকটাকে ধরবার আর কোন আশা

নেই। দেখতে দেখতে সে পাহাড়ের ধার দিয়ে নীচে নেমে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃই যে রকম গাঢ় হয়ে আসছিল তাতে লোকজন লাগিয়েও তাকে খুঁজে বার করা তখন অসম্ভব।

মামাবাবু কাছে এসেই অবাক হয়ে বল্লেন,—"এ কি, তোর মাথায় রক্ত কেন?"

মাথা কেটে যে রক্ত পড়ছিল তা এতক্ষণ টের পাইনি। দেখলাম কাঁধের জামাটা পর্য্যন্ত লাল হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবার তখন সময় নেই। আমি সংক্ষেপে ঘটনাটা তাঁদের বল্লাম।

লাওচেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেও মামাবাবু নিতান্ত সহজভাবে বল্লেন—"দাঁড়া তোর মাথাটা কতখানি কাটল আগে দেখি।"

বিরক্ত হয়ে আমি বল্লাম,—"মাথা পরে দেখলে চলবে। এদিকে লোকটা যে পালিয়ে গেল।"

"তার আর কি করা যাবে? এখন ত আর উপায় নেই।" বলে মামাবাবু তাঁবুর আলোটা জ্বালাতে গেলেন।

বিস্মিতকণ্ঠে লাওচেন জিজ্ঞাসা করলে,—"লোকটার মতলব কি ছিল মনে হয়?"

মামাবাবু আলো জ্বালতে জ্বালতে বল্লেন—"কি আবার! চুরিটুরি হবে। এখানকার কাচীনরা ত এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত।"

আমি উত্তেজিতভাবে বলতে যাচ্ছিলাম—"সে কাচীন নয়, কাচীনদের অমন চেহারা বা পোষাক হয় না।" কিন্তু সে কথা

বলবার দরকার হ'ল না। আলো জ্বলে উঠতেই ঘরের মেঝেয় একটি জিনিষ একসঙ্গে আমাদের তিন জনেরই চোখে পড়ল।

ভাঁজ করে মোড়া একটি কাগজ মেঝেয় পড়ে আছে। সে কাগজের ওপর মেয়ের মুখ বসান বাদুড়ের সেই ছবি আঁকা।

লাওচেন নীচু হয়ে সেটা কুড়োতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগে মামাবাবু একরকম ছোঁ মেরেই সেটা তুলে নিলেন।

মামাবাবু কাগজটা তুলে নিয়েই ভাঁজ খুলে সেটা পড়তে আরম্ভ করেছিলেন।

মামাবাবু যত দেরী করছিলেন, লাওচেন ও আমি তত বেশী অধীর হয়ে উঠছিলাম। লাওচেনের অধৈর্য্য বুঝি আমার চেয়ে বেশী।

মামাবাবু কিন্তু বৃথাই চেষ্টা করছিলেন বোঝা গেল। খানিকবাদে কাগজটা লাওচেনের হাতে দিয়ে তিনি বল্লেন,—"পড়ে দেখুন। চীনে ভাষার বিদ্যে আমার অত্যন্ত সামান্য। যেটুকু জানি তাতে এ চিঠি পড়া অসম্ভব। শুধু একটা কথার বোধ হয় মানে করতে পেরেছি।"

আমি একটু অসহিষ্ণু হয়ে বল্লাম, "শুধু একটা কথা পড়বার জন্যে এতক্ষণ ধরে কসরৎ করবার কি দরকার ছিল!"

মামাবাবু বল্লেন, "শুধু দেখলাম একটু চেষ্টা করে।"

লাওচেন চীনে ভাষা নিশ্চয়ই জানে কিন্তু সেও চিঠিটার ওপর যতক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইল তাতে চীনের মত শক্ত

ভাষারও গোটা একটা গল্প বোধ হয় পড়া যায়। মামাবাবু ততক্ষণে আমার কপালটা বেঁধে ফেলেছেন। সে যে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এটুকু বোঝা যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে যেন নিজেকে শান্ত করে সে মামাবাবুকে বল্লে,—"আপনি চিঠির কি মানে করেছেন?"

মামাবাবু একটু থেমে বল্লেন,—"মানে আমি কিছুই ঠিক করতে পারিনি। চীনে অক্ষরের ত আর মাথামুণ্ডু বোঝবার উপায় নেই। এক একটা অক্ষরের এক জাহাজ মানে। তবে বাদুড়ের ডানা সম্বন্ধে কি একটা কথা যেন আছে।"

লাওচেন খানিক চুপ করে থেকে মামাবাবুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে—"আপনি ঠিকই ধরেছেন। বাদুড়ের ডানার কথা এতে আছে এবং তার সঙ্গে আর যা আছে তা ভয়ঙ্কর।"

ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম—'কী?'

চিঠিটা খুলে ধরে লাওচেন বল্লে,—"চিঠিটা আগে তর্জ্জমা করে বলি শুনুন। চিঠিতে লিখছে—মায়া-বাদুড়ের চোখ অন্ধকারেও দেখতে পায়, অরণ্য-পর্ব্বত তার ডানাকে বাধা দিতে পারে না। প্রস্তুত থেক। আজ তোমাদের শেষ দিন।"

"কিন্তু এ হুমকির মানে কি? মায়াবাদুড়ই বা কি?"

লাওচেন বল্লে,—"মায়াবাদুড় যে কি সেটুকু আপনাদের বলতে পারি।" বলতে বলতে লাওচেনের স্বরও যেন আতঙ্কে

কেঁপে উঠল। "আমি এদের কথা কিছু জানতে পেরেছি। মায়াবাহুড় একজন কেউ নয়—একটা প্রকাণ্ড গোপন সম্প্রদায়। সমস্ত চীন ব্রহ্মদেশ জাপান পর্য্যন্ত এদের শাখা আছে। এরা যে কি ভয়ানক হিংস্র তা আপনারা কল্পনাও করতে পারেন না। এরা করতে পারে না এমন কাজ নেই, এদের ক্ষমতাও অসাধারণ।"

"কিন্তু আমাদের ওপর এদের আক্রোশ হবার কারণ কি? মিচিনাতেও মামাবাবু এই রকম চিঠি পেয়েছিলেন।"

লাওচেন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বল্লে,—"মিচিনাতেও পেয়েছিলেন? কি ছিল তাতে?"

মামাবাবু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই আমি বল্লাম—"তাতে আমাদের এ অভিযানে বেরুতে মানা করা হয়েছিল।"

লাওচেন বল্লে—"তবু আপনারা সে মানা শোনেন নি। তবে আপনারা ত জানতেন না। মায়াবাহুড়-সম্প্রদায়ের সব কথা জানলে বোধ হয় পারতেন না এ পথে আসতে?"

"কিন্তু বেরিয়ে যখন পড়েছি এখন কি করা যাবে! আজকের চিঠিতে এ ভাবে ভয় দেখাবার অর্থ কি?"

লাওচেন গম্ভীর ভাবে বল্লে—"শুধু শুধু ভয় এরা দেখায় না।"

"তাহলে আপনি কি বলতে চান!"

"আমি বলতে চাই-না, আমি জানি যে আজ ভয়ঙ্কর কোন কাণ্ড ঘটবেই। একটা প্রাণ অন্ততঃ নষ্ট হবেই।"

মামাবাবু এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও একটু হেসে বল্লেন—"সেটা আমাদের ত নাও হতে পারে।"

লাওচেন কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বল্লে,—"সেই চেষ্টা ত অন্ততঃ করতে হবে। আমাদের আজ অত্যন্ত সাবধান আর সজাগ থাকা দরকার।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"আমাদের কি করা উচিত? তাঁবুতে আর দুজন পাহারার ব্যবস্থা করব?"

"তা করতে পারেন। কিন্তু আজ আমি নিজে এসে আপনাদের সঙ্গে থাকব।"

মামাবাবু ভদ্রতা করেই বোধ হয় বল্লেন—"তার দরকার নেই। আমাদের বিপদ আপনার ঘাড়ে চাপাতে চাই না।"

লাওচেন সে কথায় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্লে,—"আপনারা আমার যে উপকার করেছেন তার বদলে এটুকু করবার সুযোগ থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না। অবশ্য আমি কতটুকু সাহায্য করতে পারব জানি না।"

মামাবাবু আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু লাওচেন বাধা দিয়ে দৃঢ়স্বরে বল্লে,—"সে হবে না। আপনাদের বিপদের ভাগ নিতে আমি বাধ্য। আজ আমি এখানেই কাটাব।"

শেষ পর্য্যন্ত সেই ব্যবস্থাই হ'ল। ঠিক হ'ল লাওচেনের তাঁবুতে মঙ্পো ও আর আমাদের কাচীন চাকর পাহারায় থাকবে। আমাদের তাঁবুতে থাকব আমরা তিন জন। আমাদের

অনুচরদের ভেতর থেকে আর কাউকে পাহারায় ডাকতে মামাবাবু রাজী হলেন না। প্রথমতঃ ব্যাপারটাকে জানাজানি হতে দিয়ে অনুচরদের ভেতর ভীতি সঞ্চার করতে তিনি চান না, দ্বিতীয়তঃ অনুচরদের ভেতর কে বিশ্বাসী কে অবিশ্বাসী তাঁর মতে ঠিক করা এখন কঠিন। তাদের কাউকে ডাকলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জঙ্গলের পথে এমন অদ্ভুত রাত আমাদের কোনদিন কাটেনি। সশস্ত্র হয়ে তিনজনে মুখোমুখী বসে আছি। তাঁবুর ভেতর উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর রাত্রে পাছে ঘুম আসে বলে ষ্টোভে কড়া কফির জল ফুটোন হচ্ছে। কোন রকম সাড়া শব্দ আর নেই। আমরা পরস্পরের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পর্য্যন্ত পারছি না।

রাত ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। জঙ্গলের পোকা মাকড়ের গাঁদি লেগে গেছে তাঁবুর ভেতরে। তবু আলো জ্বালিয়ে রাখতেই হবে। লাওচেন এক সময়ে উঠে পড়ে বল্লে—"ইচ্ছে করলে আপনারা একজন একজন করে ঘুমিয়ে নিতে পারেন!"

আমি রাজি হলেও মামাবাবু কিন্তু রাজি হলেন না। বল্লেন "কি দরকার ; এত কষ্ট সওয়া গেছে, একটা রাত জাগলে কি আর হবে।"

রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জঙ্গলও যেন জেগে উঠছে। রাত্রির অন্ধকারে চারিধারে অদ্ভুত সব শব্দ। সে সব শব্দের অর্থ বুঝতে পারলে জঙ্গলের বিচিত্র কাহিনী যেন জানা যায়। একবার মনে হল অনতিদূরে কোথায় যেন কাসির মত শব্দ পাওয়া গেল। সে কাসি সম্ভবতঃ কেঁদো বাঘের গলার আওয়াজ! হঠাৎ এক সময়ে সমস্ত জঙ্গল সচকিত হয়ে উঠল

ভীষণ সোরগোলে। সে সোরগোল কিন্তু খানিক বাদেই থেমে গেল। গাছের মাথায় বাঁদরেরা কিসের ভয় পেয়ে কিচিমিচি করে লাফালাফি করে উঠেছিল। হয়ত কোন বিশাল বোড়া সাপই তাদের আশ্রয়ে হানা দিয়েছে, কিংবা শয়তান কোন নিঃশব্দচারী চিতা। থেকে থেকে নিশাচর প্যাঁচার অদ্ভুত ডাক আমাদের কাছেই শোনা যাচ্ছে।

প্রত্যেক বার শব্দ হলেই লাওচেন সভায় উৎসুকভাবে কাণখাড়া করে থাকছিল। জিজ্ঞাসা করলাম—"কি শুনচেন?"

লাওচেন অদ্ভুতভাবে হেসে বল্লে, "মায়াবাদুড়ের সঙ্কেত শোনবার চেষ্টা করছি।"

"সঙ্কেত আবার কোথায়? জঙ্গলের জানোয়ারের আওয়াজই ত পাওয়া যাচ্ছে।"

"জানোয়ারদের আওয়াজ নকল করেই তারা সঙ্কেত করে পরস্পরকে।"

লাওচেনের কথা শেষ হতে না হতে পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত সমস্ত শরীরকে অবশ করে যেন বয়ে গেল। অদ্ভুত একরকম পাখীর ডাক। অন্ধকার যেন ককিয়ে উঠেছে। লাওচেন না বলে দিলেও বোধ হয় বুঝতে পারতাম সে আওয়াজ স্বাভাবিক নয় কোনমতেই।

লাওচেন ধড়মড় করে উঠে পড়ল। তার হল্‌দে মুখ আরো হল্‌দে হয়ে গেছে ভয়ে। অস্পষ্ট স্বরে বল্লে,—"সময় হয়েছে।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে তাঁবুর দরজা খুলে বাইরে টর্চ্চটা ফেল্লাম। আমাদের তাঁবুর কাছের একটা গাছ থেকে পাখা ঝটপট করতে করতে সত্যিই একটা বড় পাখী উড়ে গেল। আর কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না। ফিরে এসে বল্লাম—"কোথায় কি? সত্যিই ত একটা পাখী দেখলাম।"

লাওচেন তেমনি পাংশুমুখে বল্লে,—"ভালো! তবু এবার প্রস্তুত থাকুন।"

মামাবাবুর কি হচ্ছিল বলতে পারি না কিন্তু আমার ত সমস্ত দেহ উত্তেজনায় কাঁপছিল। জানা শত্রুর সঙ্গে সামনাসামনি যোঝা যায়, সে শত্রু যত ভয়ঙ্করই হোক, কিন্তু এই অদৃশ্য রহস্যময় শত্রুর অপেক্ষায় এভাবে বসে থাকার যন্ত্রণা অসহ্য। কি ভাবে সে দেখা দেবে কিছুই জানি না। তার আক্রমণের ধরণও অজ্ঞাত। তাঁবুর তিনদিকে তিনটি ফুটোতে মাঝে মাঝে চোখ লাগিয়ে দেখছি, বাইরের অন্ধকারে কি হচ্ছে কিছুই কিন্তু তাতে বোঝা যায় না। কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলাম না। পিস্তলটা শক্ত করে চেপে ধরলেও বুঝতে পারছিলাম আমার হাত ঘেমে উঠে, মুঠি শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হল না। হঠাৎ নিশাচর পাখীর সেই অদ্ভুত ডাকে আবার মনে হ'ল রাত্রির আকাশ একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হয়ে গেল। তার পরেই আমাদের তাঁবুর ফাঁক গুলির ভেতর দিয়ে

দেখা গেল আগুনের আঁচ। কাছেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে !

ব্যাপার কি ? আমি বাইরে ছুটে বেরুতে গেলাম। মামা বাবু আমায় একবার বাধা দিতে গেছলেন কি ভেবে কে জানে। তারপর বল্লেন "চল"। লাওচেন চীৎকার করে বল্লে,—"সবাই মিলে অমন করে বেরুবেন না।"

কিন্তু আমি তখন উত্তেজনার শিখরে উঠেছি। নিজেকে থামাবার ক্ষমতা আর নেই। আমি বেরিয়ে পড়লাম কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে। তাঁবুর ভেতর ওই ভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে তিল তিল করে যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে যা হোক একটা কিছু করতে পারলে বেঁচে যাই।

বাইরে বেরিয়েই শুনলাম, মঙ্পো ও কাচীন চাকরটার চীৎকার। লাওচেনের তাঁবুই দাউদাউ করে জ্বলছে। এবং তার ভেতর থেকে তারা কোন রকমে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। কাচীন চাকরটার হু'এক জায়গা বেশ পুড়েও গিয়েছিল। তার ভীত চীৎকার আর কান্না আর থামতে চায় না।

আগুন নেভাবার চেষ্টা করা তখন বৃথা। সমস্ত তাঁবু ধরে উঠেছে। তার শিখায় বনের অনেকখানি আলোকিত। কিন্তু দেখবার সেখানে কিচ্ছু নেই। কেমন করে আগুন লাগল, তারা কিছু দেখেছে কিনা সে সব তখন জিজ্ঞাসা করা বৃথা। তাদের হুজনকে একটু শান্ত করে আমাদের তাঁবুতে আনবার ব্যবস্থা

করছি এমন সময়ে আবার চমকে উঠলাম। এবার পিস্তলের শব্দ। এবং আমাদেরই তাঁবুর ভেতর থেকে।

এতক্ষণে খেয়াল হ'ল, মামাবাবু আমার সঙ্গে আসবেন বলেও ত আমায় অনুসরণ করেননি। সেই সঙ্গে বুকটা কেঁপে উঠলো আতঙ্কে। লাওচেন বলেছিল—"একটি প্রাণ আজ নষ্ট হবেই।"

মঙ্পোকে আমায় অনুসরণ করবার ইসারা করে আবার নিজেদের তাঁবুতে এসে ঢুকলাম। তারপর সামনে যে দৃশ্য দেখ-লাম তাতে খানিকক্ষণের জন্যে সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল।

আমার পায়ের শব্দে প্রথমে লাওচেন চমকে উঠে পিস্তলটা আমার দিকেই তুলে ধরেছিল কিন্তু তারপর লজ্জিতভাবে সেটা নামিয়ে বল্লে, কাতরভাবে—"দেখুন কি হয়েছে! এই জন্যেই আপনাকে যেতে বারণ করেছিলাম। তিনজনে একসঙ্গে থাকলে বোধ হয় এ-ব্যাপার ঘটত না।"

"কিন্তু কি হয়েছে কি! মামাবাবু বেঁচে আছেন ত!"

লাওচেন আমার কথার উত্তরে যা বল্লে তাতে নিজের নির্ব্বু-দ্ধিতার জন্যে আফশোষের আর সীমা রইল না। কেন আমি মূর্খের মত এ বিপদের মধ্যে বেরুতে গিয়েছিলাম। মামাবাবু আমার সঙ্গে যাবার জন্যে পেছন ফিরে তাঁর পিস্তলটা নিতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে লাওচেন দরজার গোড়ায় শত্রুকে দেখতে পায়। মামাবাবু তখন তার সামনে। পিস্তল ছোড়বার

সুবিধা পাবার আগেই শত্রু ভারী একটা দণ্ড দিয়ে মামাবাবুর মাথায় সজোরে আঘাত করে। লাওচেন তারপর গুলি করেছে সত্য কিন্তু ক্ষতি কিছু করতে পারেনি।

লাওচেন যতক্ষণ কথা বলছিল ততক্ষণ আমি মামাবাবুর কাছে বসে তাঁকে পরীক্ষা করছিলাম। মাথার আঘাত গুরুতর, রক্ত সেখানে চুলের সঙ্গে জমাট বেঁধে গেছে। মামাবাবুর জ্ঞান এখনও নেই কিন্তু প্রাণ আছে বলেই মনে হ'ল। বুকের স্পন্দন শোনা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে।

লাওচেন সে কথা শুনে আগ্রহভরে মামাবাবুকে আর একবার পরীক্ষা করে বললে, "হ্যাঁ আছে বলেই মনে হচ্ছে। এখন খুব সাবধানে রাখা প্রয়োজন। আগে মাথার ঘা-টা পরিষ্কার করে বাঁধতে হবে।"

আমি সেই ব্যবস্থা করতে গিয়ে সহসা চমকে উঠে বল্লাম, "দরজার কাছে কিসের রক্ত লাওচেন? মামাবাবুর রক্ত ত ঘরের মাঝখানেই পড়েছে।"

"দরজার কাছে রক্ত? কই দেখি!" বলে লাওচেন এগিয়ে এল। তারপর সোল্লাসে বল্লে—"তাহলে আমার গুলি ব্যর্থ হয়নি। নিশ্চয়ই তার গায়ে ভাল রকম লেগেছে। এইত রক্তের আরও দাগ। শীগ্‌গীর আসুন আমার সঙ্গে। লোকটা দস্তুরমত জখম হয়েছে। এ রকম গুলি খেয়ে বেশীদূর সে যেতে নিশ্চয়ই পারেনি। এখনি তাকে ধরতে পারা যাবে।"

"কিন্তু মামাবাবু যে রইলেন !"

"তু মিনিট শুধু। মঙ্‌পো রয়েছে কোন ক্ষতি হবে না। মামাবাবুর জন্যই এ শয়তানকে ধরবার চেষ্টা করা উচিত।"

সেই কথা ভেবেই কাচীন চাকরটাকে দরজায় রেখে আমরা এগিয়ে গেলাম।

রক্তের দাগ কিন্তু খানিকটা দূর গিয়েই একেবারে যেন ভোজ-বাজিতে মিলিয়ে গেল। আশে পাশে সমস্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, লুকোবার কোন জায়গা নেই। এক জায়গায় অনেক-খানি রক্ত জমাট বেঁধে আছে। মনে হ'ল সেখানে লোকটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল কিন্তু তারপর সে গেল কোথায় ! নিঃশব্দে কোন হিংস্র শ্বাপদই কি তাকে তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু তা-হলেও ত রক্তের দাগ থাকবে। আর এখন নিভে এলেও তখন যে রকম ভাবে লাওচেনের তাঁবু জ্বলছিল তাতে হিংস্র শ্বাপদের কাছাকাছি সাহস করে আসা সম্ভব নয়।

বিমূঢ় ভাবে কিছুই বুঝতে না পেরে আমরা আবার তাঁবুতে ফিরলাম, কিন্তু সেখানে আরো ভয়ানক বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

তাঁবুতে ঢুকে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। ভেতরে মঙ্‌পো বা মামাবাবু কেউ নেই। মাত্র এই কয়েক মিনিট। কাচিন চাকর দরজায় বসে আগাগোড়া পাহারা দিচ্ছে।

এর ভেতর একটি সুস্থ ও একটি অচেতন লোক এই তাঁবুর ভেতর থেকে উধাও হয়ে গেল কোথায় ?

তাঁবুর ভেতর ঢুকে খানিকটা বিস্ময়ে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। লাওচেনের মুখ দেখেতো মনে হচ্ছিল আমার চেয়ে সে যেন অনেক বেশী ভয় পেয়ে একেবারে বিহ্বল হয়ে গেছে। কি যে এখন করা উচিত সে বিষয়ে মনস্থির করবার ক্ষমতাও আমাদের নেই।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে তাঁবুর ভেতর আমরা যা দেখে গিয়েছিলাম তার চেয়ে বেশী বিশৃঙ্খলতার কোন চিহ্ন নেই। যে 'রাগের' ওপর মামাবাবুকে শোয়ান হয়েছিল সেটা পর্যন্ত এতটুকু ভাঁজ হয় নি। কোথাও এতটুকু ধ্বস্তাধ্বস্তির পরিচয়ও পাওয়া গেল না। মামাবাবু না হয় অচৈতন্য হয়েছিলেন কিন্তু মঙপো ত সুস্থ ছিল ; সে কি একটু বাধা দেবার অবসরও পায় নি ! সুস্থ ও অচৈতন্য দুটি লোককে এই অল্প সময়ের মধ্যে কাবু করে সরিয়ে ফেলাত কম বাহাদুরী নয়।

যারাই যেমন ভাবে একাজ করে থাক তাদের ক্ষমতার প্রশংসা করতে হয়। সমস্ত ব্যাপার এমন নিঃশব্দে নিখুঁত ভাবে করা হয়েছে যে অলৌকিক কোন ব্যাখ্যার দিকেই মন প্রথমটা ঝুঁকে পড়ে।

সম্ভবতঃ সেই জন্যেই প্রথমটা আমরা তাঁবুর ভেতর অসাধারণ কিছু দেখতে পাইনি।

এইবার চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম।

লাওচেনও বোধ হয় আমার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেয়েছিল। দুজনে এক সঙ্গে তাঁবুর ধারে এগিয়ে গেলাম। এবার আর বুঝতে বাকী রইল না। দরজায় কাটীন চাকর পাহারায় থাকা সত্ত্বেও কোথা দিয়ে শত্রু তাঁবুতে প্রবেশ করে তাদের কাজ হাসিল করেছে। কোন ধারাল অস্ত্রে তাঁবুর পেছনের দেয়ালের কাপড় প্রায় তিন হাত চেরা হয়েছে দেখা গেল। সেইখানের তাঁবুর কাপড় সরিয়েই যে তারা ভেতরে ঢুকেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তারপর কেমন করে নিঃশব্দে দুটি মানুষকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সে রহস্য অবশ্য এই সূত্রটুকু থেকে মীমাংসিত হ'ল না। আমরা দুজনেই তৎক্ষণাৎ পেছনের সেই কাটা অংশ সরিয়ে তাঁবুর বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বাইরে লাওচেনের তাঁবুর আগুন প্রায় নিভে এসেছে। চারিধারের গাঢ় অন্ধকার সে নিভু নিভু আগুন কিছুমাত্র আর দূর করতে পারছে না।

আমাদের তাঁবুর এই পেছন দিকটা, আগুন যখন প্রবল ভাবে জ্বলছে তখনও নিশ্চয়ই অন্ধকার ছিল। শত্রু সেই অন্ধকারেরই সুযোগ নিয়েছে। আমরা যখন প্রথমবার তাঁবুর বাইরে রক্তের দাগ অনুসরণ করে যাই, তখন আমাদের কয়েক হাত মাত্র দূরে থাকলেও তাদের আমরা দেখতে পাইনি।

টর্চ্চ নিয়ে আমরা এবার অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। কিন্তু এই গহন অন্ধকারে কোথায় তাদের খোঁজ পাওয়া যাবে! আগের বারে তবু রক্তের দাগ ধরে খানিকটা অগ্রসর হওয়া গেছল এবারে সামান্য কোন চিহ্নও নেই। এক রাত্রের মধ্যে দুবার আমাদের এক রকম চোখের ওপরেই এমন রহস্যময় অন্তর্ধান ঘটল যার কোন কিনারাই হয় না।

সপ্তম পারচ্ছেদ

হতাশ হয়ে যখন তাঁবুতে ফিরে এলাম তখন আমার মনের অবস্থা বর্ণনা করবার মত নয়। প্রথম দিকটা বিপদের মাঝে বিমূঢ় হয়ে ভালো করে কিছু উপলব্ধি করতে পারি নি। এইবার সম্পূর্ণ ভাবে বোঝার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিসত্যি চোখে অন্ধকার দেখলাম!

মুখে আগে যাই বলে থাকি, এই অজানা দেশে বিপদের মাঝে যাঁর ভরসায় আসতে সাহস করেছিলাম সেই মামাবাবুর এই পরিণামের পর আমার উপায় কি হবে! কোথায় আমি দাঁড়াবো এখন! কি আমার এখন কর্ত্তব্য?

জীবিত থাকুন বা না থাকুন মামাবাবুর সন্ধান করা এখন দরকার। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? সম্পূর্ণ অজানা বিপদ-সঙ্কুল দেশ। এ পর্য্যন্ত সামান্য যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে বোঝা কঠিন নয় যে শত্রুও যেমন রহস্যময় তেমনি অসামান্য শক্তিমান। তাদের বিরুদ্ধে আমি কি করতে পারি! করতে চাইলেও মামাবাবুর অভাবে আমাদের দলের লোকেরাই আমার বাধ্য আর থাকবে কিনা সন্দেহ। একা একা এখানে কিছু করবার চেষ্টা বাতুলতা। হিংস্র শ্বাপদের হাতেই তাহলে আগে প্রাণ দিতে হবে।

অথচ ফিরে যাওয়াও অসম্ভব। মামাবাবুর খোঁজ না নিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ফিরে যেতে আমি কিছুতেই পারব না।

হতাশ ভাবে কোন দিকে কোন কূল দেখতে না পেয়ে আমি দু'হাতের ভেতর মাথা গুঁজে বসেছিলাম। লুকিয়ে কোন লাভ নেই, এই নিদারুণ অবস্থার মধ্যে পড়ে তখন আমার চোখও সজল হয়ে উঠেছিল। সজল হয়েছিল নিজের কোন বিপদের কথা ভেবে নয়। সব দিক দিয়ে এমন করে সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায়, নিজের অক্ষমতায় ও মামাবাবুর শোচনীয় পরিণামের কথা ভেবেই ক্ষোভে দুঃখে নিজেকে আর সামলাতে পারিনি।

মাথা গুঁজে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ চমকে উঠলাম। লাওচেন কাছে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে হাত রেখেছে।

আমি মুখ তুলে তাকাতেই সে বল্লে,—"ভাববেন না মিঃ সেন, আপনার মামার সন্ধান আমি করবই। এই শয়তানির প্রতিশোধ নেওয়া আমার নিজের দায় বলে আমি মনে করি জানবেন।"

মুখে আমি কিছু বলতে পারলাম না কিন্তু আমার চোখে সে মুহূর্ত্তে যে অসীম কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছিল তা বুঝতে লাওচেনের নিশ্চয়ই ভুল হয়নি।

লাওচে খানিক চুপ করে থেকে বল্লে,—"আমার এতে একদম স্বার্থ নেই মনে করবেন না। আপনাদের সাহায্য নিয়ে

আমি 'ইউনানে' যাবার চেষ্টা করছিলাম। আপনাদের অভিযান ব্যর্থ হলে তাই আমারও সমূহ ক্ষতি। তা ছাড়া এ কয়দিনে আপনাদের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে তার জন্যেও এ অবস্থায় আমি শুধু নিজের সুবিধার কথা ভাবতে পারি না। বন্ধুত্বের উপকারের ঋণও অন্ততঃ আমায় শোধ করবার চেষ্টা করতে হবে।"

আমি এইবার বল্লাম,—"আপনার কি আশা হয় মামাবাবুর খোঁজ পাওয়া যাবে? আপনি নিজেই ত 'মায়াবাছুড়'দের ভয়ঙ্কর প্রতাপ ও ক্ষমতার কথা বলেছেন!"

"তা বলেছি এবং এখনও বলছি যে তারা ভয়ঙ্কর। কিছু তাদের অসাধ্য নয়, তাদের শত্রুতা করা মানে স্বয়ং যমকে ঘাঁটান। কিন্তু তা বলে ত নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে না।"

এই চীনেম্যানের প্রতি শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় সত্যি আমি এবার অভিভূত হয়ে গেলাম। উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরে বুঝি একটু বিহ্বল ভাবেই বল্লাম—"এ সময়ে তোমার এ সাহায্যের কথা আমি জীবনে ভুলব না লাওচেন! অথচ এক দিন তোমাকেও আমি সন্দেহ করেছিলাম।

লাওচেন কোনপ্রকার উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে তার টেরছা চীনে চোখ শুধু অর্দ্ধ নিমীলিত করে বল্লে—"সময়ই আমাদের সব ভুল শুধরে দেয় মিঃ সেন!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কিন্তু মামাবাবুর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অন্ততঃ এই কয়দিনে তেমন কোন সূত্র আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি বলতে পারিনা। লাওচেনের পরামর্শ মত, পাহাড় থেকে সমতলক্ষেত্রে নেমে হার্ট্‌জ্ কেল্লা বাঁদিকে রেখে শানেদের দেশের ভেতর দিয়ে আমরা আবার গহনতর পার্ব্বত্য অরণ্যে এসে পৌঁছেছি। হার্ট্‌জ কেল্লায় আমরা ইচ্ছা করেই আশ্রয় নিইনি। লাওচেনের মত যে ঠিক এবিষয়ে কোন সন্দেহ আমার ছিল না। সেখানে সহকারী কর্ত্তৃপক্ষের কাছে বিশেষ কোন সাহায্য পাওয়ার আশা বৃথা। তারা 'মায়াবাহুড়ে'র ব্যাপার আজগুবি বলেই সম্ভবতঃ উড়িয়ে দিত। তার ওপর মামাবাবু না থাকায় আমাদের আর অগ্রসর হবার অনুমতি পাওয়াই শক্ত হত। তাদের সাহায্য চাইতে গিয়ে সব দিক নষ্ট করার চেয়ে নিজেদের চেষ্টায় যতটা করতে পারি তার ব্যবস্থা করা ঢের বেশী প্রয়োজনীয় বুঝেই আমরা গোপনে শান প্রদেশ পার হয়ে এসেছি।

অবশ্য পথ ও গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে আমাকে লাওচেনের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। এ অঞ্চল তারই পরিচিত। শত্রুদের চালচলনও তারই জানা। এ ব্যাপারে তার ওপর কোন কথা বলা আমার উচিত নয়। তার প্রয়োজনও হয়নি।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল পার হয়ে লাভ কি হ'ল? পর্ব্বত যেমন দুরারোহ, অরণ্য এখানে তেমনি গভীর। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুপেয়ে জীব হিসাবে এখানে মানুষ নিজের গৌরব সব জায়গায় বজায় রাখতে পারে না। হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হয় এমন খাড়াই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আবৃত পাহাড়ই বেশী। এর কিছু দূরেই বামনাকৃতি 'দারুদের' অজানা দেশ। মামাবাবুর অভিযানের এই দেশই অবশ্য লক্ষ্য ছিল কিন্তু তাঁর সন্ধানে এখানে আশা কতদূর যুক্তিযুক্ত আমি বুঝতে পারছিলাম না। লাওচেনের অবশ্য ধারণা অন্য রকম। 'মায়াবাদুড়'দের সন্ধান এখানেই পাওয়া যাবে বলে তার স্থির বিশ্বাস। এতদিনেও কোন ঘটনায় সে ধারণার সমর্থন না পেয়ে একদিন আমি তার সঙ্গে একথা আলোচনা করতে বাধ্য হলাম।

পাহাড়ের দুর্গম চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে সমস্ত দিনে সেদিন মাত্র মাইল সাতেক আমরা পার হয়েছি। যেখানে আমাদের তাঁবু পড়েছে সেটি দুটি পাহাড়ের মাঝখানের একটা গলির মত স্থান—ঘন অরণ্যে ঢাকা। দুধারে খাড়া পাহাড় কতদূর যে উঠে গেছে বলা যায় না। তারই মাঝখানে সঙ্কীর্ণ একটু গিরিসঙ্কটে তাঁবুর ভেতরও যেন স্বস্তি বোধ করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল দুধার দিয়ে পাহাড় যেন জীবন্ত দৈত্যের মত যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদের চেপে পিষে ফেলতে পারে।

লাওচেন ও আমি আজকাল এক তাঁবুতেই থাকি। আমাদের

কুলিরা সমস্ত মালপত্র নিয়ে আর একটি তাঁবু ব্যবহার করে। এখানে শীতের প্রচণ্ডতার জন্যে ও হিংস্র শ্বাপদের ভয়ে তাঁবু ব্যবহার না করে উপায় নেই।

বাইরে গাঢ় অন্ধকার রাত। লাওচেন একটা কাগজের ওপর ম্যাপ এঁকে আমাদের যাত্রাপথ ঠিক করছিল। আমি আমার বন্দুকটা পরিষ্কার করতে করতে তাকে বল্লাম—"আর অগ্রসর হতে আমার মন কিন্তু চাইছে না লাওচেন!"

"কেন?" লাওচেন ম্যাপ থেকে মুখ না তুলেই বল্লে।

আমি একটু বিরক্ত স্বরেই বল্লাম, "কেন, তাও বলতে হবে? এতদিনে কোন পাত্তাই ত মিলিল না: আমরা যে ভুল পথে যাচ্ছিনা তার প্রমাণ কি?"

লাওচেন ম্যাপটা সরিয়ে রেখে বল্লে, "প্রমাণ অবশ্য কিছু নেই—"

"তাহলে এ হায়রানীতে লাভ কি? আমার মনে হয় 'মায়া-বাদুড়'দের অত ভয়ঙ্কর ভেবেই আমরা ভুল করেছি। আমাদের হার্টজ কেল্লাতেই যাওয়া উচিত ছিল। এই গহন জঙ্গলে অন্ততঃ তাদের কোন খোঁজ মিলবে না।"

আমার মুখের কথা মুখেই খানিকটা রয়ে গেল। লাওচেন ও আমি দুজনেই এক সঙ্গে চমকে উঠলাম। বাইরে নিশাচর কোন পাখীর ভয়ঙ্কর ডাকে অন্ধকার পর্য্যন্ত যেন শিউরে উঠল।

আমার সমস্ত শরীর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল। মামাবাবুর

দেহ যেদিন অন্তর্হিত হয় সেদিন এই নিশাচর পাখীর ডাক থেকেই কি সব বিভীষিকাময় ঘটনার সূত্রপাত হয় সে কথা ত কোন দিন ভোলবার নয়। নিজের অজ্ঞাতে আমার হাত কোমরবন্দের পিস্তলে গিয়ে তখন পৌঁছেচে।

কিন্তু লাওচেন প্রথমে চমকে উঠলেও তারপর হেসে উঠল।

"ওকি হাসছেন যে!" আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"হাসছি আপনার রকম দেখে।"

"আমার রকম দেখে! কেন আপনি কি কালা নাকি! শুনতে পাননি?"

"শুনতে পাব না কেন! কিন্তু তাতে ভয় পাবার কিছু নেই।"

আমায় অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে লাওচেন আবার বল্লে,—"আসল আর নকলের তফাৎ বোঝবার মত আপনার কাণ এখনো তৈরী হয়নি। এ হ'ল এদেশের 'টিঙ্কার' বার্ড বলে এক রকম পাখীর আসল ডাক। মায়া-বাহুড়েরা এই আওয়াজেরই নকল করে—সঙ্কেত করবার জন্যে। কিন্তু সে নকল আওয়াজ ধরা যায়।"

আমি আবার একটু অপ্রস্তুত হয়েই বন্দুক পরিষ্কার করায় মন দিলাম। লাওচেনের কথায় সত্যি কথা বলতে গেলে আশ্বস্ত

হওয়ার চেয়ে হতাশই হয়েছিলাম বেশী। ভয় যতই পেয়ে থাকি সেই নিশাচর পাখীর ডাকে প্রথমে মনে একটু আশাও জেগেছিল। আশা হয়েছিল এই ভেবে যে মায়াবাদুড়দের সাড়া অন্ততঃ এতদিনে পাওয়া গেল। যে কোন রকমে মায়াবাদুড়দের সন্ধান পাওয়াই এখন আমাদের দরকার। তা না হলে মামাবাবুর খোঁজ কেমন করে, কোন সূত্র ধরে করব। যাকে মায়াবাদুড়ের সঙ্কেত মনে করেছিলাম এখানকার সত্যকার কোন পাখীর সাধারণ ডাক শুনে তাই ভয় দূর হলেও মনটা খারাপ হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বন্দুক পরিষ্কার করা শেষ করে আমি উঠে দাঁড়ালাম। লাওচেন তখন তার ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে বিশেষ মন দিয়ে কি দেখছে।

সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে ম্যাপটার দিকে চেয়ে বল্লাম,—"আপনার এত ম্যাপ দেখা-দেখির অর্থ আমি বুঝতে পারি না লাওচেন! ম্যাপ দিয়ে কি আমাদের শত্রুর সন্ধান পাওয়া যাবে।"

ম্যাপটা উল্টে রেখে আমার দিকে ফিরে লাওচেন যেন একটু অসহিষ্ণু ভাবেই এবার বল্লে,—"ম্যাপ না হলে আমরা চলব কি ধরে?"

"কিন্তু আমরা চলেছি কোথায়?"

লাওচেন খানিক চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলে। তারপর

আমায় তার পাশে বসতে বলে একটা কাগজ টেনে নিয়ে তার ওপর কয়েকটা দাগ টেনে বল্লে,—"এর মানে কিছু বুঝতে পারছেন ?"

"বুঝতে পারছি। আমরা যে গিরি-পথে এখন এসে পড়েছি এটা তারই মানচিত্র।"

"ঠিক ধরেছেন। কিন্তু একটা কথা আপনি জানেন না। এ মানচিত্র সম্পূর্ণ নয়। আমাদের ডানদিকে পাহাড়ের পেছনে কি আছে আমরা জানি না। কেউ জানে না! এ পাহাড় তুর্লঙ্ঘ্য বলে এ পর্য্যন্ত সেখানকার মানচিত্র তৈরী হয়নি।"

"কিন্তু মানচিত্র ঠিক করতে ত আমরা আসিনি।"

"না তা আসিনি, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই আমাদের পাহাড়ের ওদিকে যাওয়া দরকার!"

"যেখানকার কথা কেউ জানে না, সেখানে গেলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে মনে করছেন কেন ?"

লাওচেন এতক্ষণে যেন একটু বিরক্ত হয়ে বল্লে,—"সব কথা বোঝাতে পারব না মিঃ সেন। এখানে আমার ওপর আপনাকে নির্ভর করতে হবে।"

"তা করছি, কিন্তু ভেবে দেখুন এতদিনেও এতটুকু সূত্র কোথাও না পেয়ে আমার পক্ষে হতাশ হওয়া স্বাভাবিক কি না। তা ছাড়া আর একটা কথা। এ পাহাড় ত তুর্লঙ্ঘ্য বলেছেন। পার হবো কি করে ?"

"যেমন করে হোক, যতদূর ঘুরে হোক পার হবার চেষ্টা করতে হবে, যদি না—"

"যদি না,—কি ?"

"যদি না ভাগ্যক্রমে 'দারু'দের গোপন পথ আমরা খুঁজে পাই! এ পাহাড় পার হবার একটা সহজ গোপন রাস্তা আছে মিঃ সেন। শুধু 'দারু'রা এবং আমার বিশ্বাস 'মায়াবাদুড়েরা' সে পথের সন্ধান জানে—"

লাওচেনের কথা শেষ হবার আগেই অপ্রসন্ন মনে আমি উঠে তাঁবুর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে একটু বিরক্তির স্বরেই বল্লাম,—"তারা ত গলা ধরে সে খবর আমাদের জানিয়ে যাবে না। আমাদের এই পাহাড় জঙ্গলে অকারণে ঘুরে মরাই সার হবে। এর চেয়ে হার্টজ কেল্লায় গিয়ে খবর দিলে হয় ত এতদিনে একটা কিনারা হ'ত।"

লাওচেন এ কথার কোন উত্তর দিলে না। আমি অন্যমনস্ক ভাবে তাঁবুর পর্দাটা সরিয়ে হঠাৎ চমকে উঠে উত্তেজিত স্বরে চাপা গলায় বল্লাম,—"লাওচেন, আমার টর্চ্চটা শীগ্‌গীর!"

বাইরে গভীর অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকির আলো ছাড়া আর কিছু দেখবার উপায় নেই। কিন্তু তারই ভেতর শুকনো জঙ্গলের পাতা মাড়িয়ে কারুর দৌড়ে চলে যাবার শব্দ আমি স্পষ্ট শুনেছি।

লাওচেন টর্চ্চ আনতেই কিন্তু সে শব্দ থেমে গেল। টর্চ্চ

ফেলে চারিদিকে ঘুরিয়ে আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।

লাওচেন উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে,—"কি, হয়েছে কি ?"

বল্লাম,—"কে যেন আমাদের তাঁবুর কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শোনবার চেষ্টা করছিল। আমি বাইরে মুখ বাড়াতেই পালিয়ে গেল।"

"পালিয়ে গেল! কিন্তু এখান থেকে ত পালাবার পথ নেই! এই সঙ্কীর্ণ গিরিপথ পেছনের দিকে মাইল চারেক এবং সামনের দিকে কতদূর যে দীর্ঘ তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। গোপন রাস্তা না জানলে আমাদের হাত এড়িয়ে সে কিছুতেই যেতে পারবে না।"

লাওচেন নিজেই এবার টর্চ টা হাতে নিয়ে এগিয়ে চল্‌ল। পায়ের শব্দটা আমাদের কুলিদের তাঁবুর দিকেই গেছল! কিন্তু সেখানে পৌঁছে চারিধারে টর্চ ফেলেও কোথাও কাউকে দেখতে পেলাম না। সঙ্কীর্ণ গিরি পথ। অনেক বড় গাছ চারিদিকে থাকলেও আমাদের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে থাকবার সুযোগ কোথাও ছিল না। দ্রুত পালিয়ে গেলেও পায়ের শব্দ আবার পাওয়া যেত।

হঠাৎ একটা সন্দেহ হওয়ায় আমি লাওচেনকে বল্লাম,—"আমাদের কুলিদের একবার ডাকো দেখি।"

"কেন? না না তোমার সন্দেহ অমূলক। তারা কেউ একাজ করবে না। তারা সবাই বিশ্বাসী। তা' ছাড়া রাত্রে

'নাটের' অর্থাৎ ভূতের ভয়ে একলা বার হবার সাহস তাদের কারুর নেই।"

আমি তবু জেদ করে বল্লাম,—"না থাক, তবু একবার দেখলে ক্ষতি কি! তুমি না হয় বাইরে টর্চ্চ জ্বেলে চারিদিকে লক্ষ্য রাখো, আমি গিয়ে দেখি।"

আমি চলে যাচ্ছিলাম; লাওচেন হঠাৎ আমার হাতটা ধরে ফেলে বল্লে,—"দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি সঙ্গে।"

"কিন্তু বাইরেও দৃষ্টি রাখা দরকার একজনের।"

"তা' হলে তুমি বরং বাইরে থেকো, আমি ভেতরে যাচ্ছি কুলিদের খবর নিতে।"

লাওচেনের বাইরে একলা থাকতে আপত্তি দেখে সত্যি একটু হাসি পেল। যাই হোক নেহাৎ তার ইচ্ছা নেই দেখে অগত্যা রাজী হলাম।

কুলিরা অধিকাংশই ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধ হয়। ডাকাডাকি করে তাদের তুলতে লাওচেনের সময় লাগল। ভেতরে যাবার পরও অনেকক্ষণ ধরে তার আর সাড়া পাওয়া গেল না।

বাইরে দাঁড়িয়ে কান খাড়া রেখে তখনও আমি চারিধারে আলো ফেলে দেখছি। চারিধার নিস্তব্ধ, আমার টর্চ্চ ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় গাছের ছায়া ছাড়া আর কিছু নড়ছে না। বাইরের কনকনে শীতে মনে হচ্ছে নাকের ভেতর দিয়ে বুক পর্য্যন্ত জমান বরফ চলে যাচ্ছে।

এ রকম ভাবে বৃথা আর দাঁড়িয়ে থাকব কিনা ভাবছি এমন সময় মনে হ'ল পাহাড়ের দিকে একটা বড় গাছের ছায়ায় সামান্য একটু যেন কিসের নড়ার আভাস পাওয়া গেল।

পিস্তলটা বেল্ট থেকে খুলে ডান হাতে নিয়ে, বাঁ হাতে টর্চ ধরে আমি এবার ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম। বেশীদূর এগুতে হ'ল না, শুকনো পাতা মড় মড়িয়ে অকস্মাৎ গাছের আড়াল থেকে যে জীবটি বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে দৌড়াল, তাকে চিনতে পেরে প্রথমটা হাসিও যেমন পেল, লজ্জা তার চেয়ে কম হ'ল না। এই সামান্য প্রাণীটির জন্যে ভয় পেয়ে, আমি কি মিথ্যে হৈ-চৈ-ই না বাধিয়ে তুলেছি। সেটি এদেশের পাহাড়ী অঞ্চলের ছাগল ও হরিণের মাঝামাঝি এক রকম প্রাণী, নাম 'গুরাল'। রাত্রির অন্ধকারে আমাদের তাঁবুর ধারে বোধ হয় সাহস করে চরতে এসেছিল, তারপর পালিয়েছিল আমার সাড়া পেয়ে। তাকেই শত্রুর চর ভেবে মিছে মিছি শীতের ভেতর আমি নিজেও নাকাল হয়েছি লাওচেনকেও নাকাল করেছি।

যাই হোক শিকার হিসাবে 'গুরাল' দুষ্প্রাপ্য জিনিষ। পিস্তল দিয়ে লক্ষ্য ঠিক করা কঠিন হলেও একেবারে চেষ্টা না করে ছেড়ে দেওয়া আমার উচিত মনে হ'ল না। তা ছাড়া জানোয়ারটাকে বেশ বাগেই পাওয়া গেছে। গিরিপথ সঙ্কীর্ণ এবং পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে অভ্যস্ত হলেও সামনের খাড়া পাহাড় 'গুরাল'টির পক্ষে পার হয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাকে শেষ পর্য্যন্ত

আমার দিকে ফিরতেই হবে এবং তখন পিস্তল দিয়ে তাকে মারা সম্ভব হলেও হতে পারে।

সামনের ছোট একটা ঢিবির আড়ালে প্রাণীটি গিয়ে থেমেছিল আমি লক্ষ্য করেছিলাম। সতর্কভাবে পিস্তল বাগিয়ে ধরে আমি সেদিকে আবার অগ্রসর হতে লাগলাম। ঢিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে সে একবার ছুটতে আরম্ভ করলেই আমি গুলি করব। ঢিবির ওধারে পাহাড়ের দেয়াল আরম্ভ হয়েছে সুতরাং সে দিকে তার যাবার উপায় নেই।

কিন্তু ঢিবির অত্যন্ত কাছে এসেও জানোয়ারটার নড়বার কোন লক্ষণ না দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। অত্যন্ত সন্তর্পণে আমি এবার টর্চ নিভিয়ে ঢিবির অপরদিকে পা টিপে টিপে গিয়ে হঠাৎ টর্চটা আবার জ্বেলে ফেললাম। কিন্তু না শোনা গেল দ্রুত পলায়নের শব্দ, না দেখা গেল গুরাল বা কোন রকম প্রাণী। সামনের পাহাড়ে সঙ্কীর্ণ একটা গুহা শুধু ভয়ঙ্কর কোন প্রাণীর মত মুখব্যাদন করে আছে।

নবম পরিচ্ছেদ

মাত্র ছ' সেকেণ্ড বোধ হয় আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপরেই আমার মাথার ভেতর দিয়ে কিছুক্ষণ আগেকার লাওচেনের সঙ্গে আলাপের কথাগুলো বিদ্যুতের মত খেলে গেল।

সামনের গুহা-মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। বিশেষ গভীর বলে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় না। মুখের ফাঁকটা বেশ ছোটই বলতে হবে। সাধারণ আকারের মানুষকে মাথা নিচু করে খুব হেঁট হয়েই তার ভেতর ঢুকতে হয়। কিন্তু তবু সেটা পরীক্ষা না করে ফেরা উচিত মনে হ'ল না। অন্ততঃ 'গুরাল'টির অন্তর্ধান-রহস্যের মীমাংসা যে সেই গুহার মধ্যেই হবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না।

টর্চ্চের আলো ভেতরে ফেলে হেঁট হয়ে তার ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। অনবরত মাথা নীচু করে যাওয়া বেশ কষ্টকর। আমার টর্চ্চের আলোয় ভয় পেয়ে অসংখ্য চামচিকে ঝটপট করতে করতে চারিধারে উড়ে বেড়াচ্ছে। গুহাতে হিংস্র কোন প্রাণীও থাকতে পারে। তবু সামান্য কয়েক পা যাবার পরই গুহা-পথ একদিকে বেঁকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়তনে বিস্তৃত হতে দেখে উৎসাহে কোন বিপদের কথাই আর মনে রইল না।

এবারে আমার মনে কোন সন্দেহই আর নেই। আশ্চর্য্য

ভাবে 'দারু'দের রাজ্যের গোপন পথই যে আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি।

কিন্তু কতদূর এই পথ ধরে একলা যাব! পথ যখন আবিষ্কৃত হয়েছে তখন কাল সদলবলে এসে তা অনুসরণ করলেই চলবে। আপাততঃ ফিরে গিয়ে লাওচেনকে এ সংবাদ দেওয়া দরকার। গুহা-পথ যে রকম নানা শাখায় জায়গায় জায়গায় বিভক্ত হয়ে গেছে তাতে বেশীদূর এগুলে হয়ত ফেরবার সময় পথ ভুলও হতে পারে।

এই সমস্ত ভেবে পেছু ফিরতে যাচ্ছি এমন সময় সামনের একটি শাখা পথ থেকে সেই 'গুরালটি' দ্রুতবেগে বেরিয়ে আমার একেবারে সামনে ভীতভাবে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েই আবার লাফ দিয়ে পালাতে উদ্যত হল। তার সঙ্গে দেখা যে কি কুক্ষণে হয়েছিল তখন যদি জানতাম। দেখবামাত্র হাতের পিস্তলের গুলি যেন আপনা থেকে ছুটে গেল এবং সেই সঙ্গে বুঝতে পারলাম নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় কি সর্ব্বনাশ নিজের করেছি।

পিস্তল নয়, মনে হ'ল যেন একেবারে আমার মাথার ওপর অনেকগুলি বজ্রপাত হয়েছে। সেই সংকীর্ণ বহুদূর বিস্তৃত গুহা-পথে পিস্তলের আওয়াজ যে কি ভয়ঙ্কর ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল তার বর্ণনা করা অসম্ভব। কিন্তু শুধু আওয়াজ হলেও রক্ষা ছিল। পিস্তলের আওয়াজে কেঁপে উঠে সমস্ত পাহাড়ই যেন দুলে উঠল। তারপর যা আরম্ভ হ'ল তাকে প্রলয় ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

পিস্তলের শব্দের এত বড় শক্তি আগে কখন কল্পনা করিনি। গুহা-পথের ওপরের ছাদে বহু আলগা পাথর নিশ্চয়ই ছিল। হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজে কেঁপে উঠে সেগুলি ভয়ঙ্কর শব্দে পড়তে আরম্ভ করল। খানিকক্ষণ সেই ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে মাথার ঠিক বোধ হয় ছিল না!

অনেকক্ষণ বাদে পাথর পড়া বন্ধ হবার পর স্বাভাবিক চিন্তা-শক্তি যেন ফিরে পেলাম। শরীর দু' এক জায়গায় পাথরের কুচিতে ক্ষত হলেও মাথাটা কেমন করে বেঁচে গেছল বলতে পারি না। কিন্তু ধূলো-বালি-পড়া চোখ রগড়ে, আতঙ্কের আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে যখন টর্চ্চটা জ্বেলে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম তখন বুঝতে পারলাম মাথাটা গুঁড়ো হয়ে গেলেই এর চেয়ে ভালো ছিল। দেখলাম বড় বড় পাথরের চাঁই পড়ে আমার দু'ধারের পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। এই অজানা পাহাড়ের গুহা-পথে নিজের নির্বুদ্ধিতায় আমি আমার জীবন্ত সমাধি রচনা করেছি।

পিস্তলটা ডান হাত থেকে একটা আল্‌গা পাথরের ঘায়ে ছিটকে পড়ে হারিয়ে গেলেও টর্চ্চটা কেমন করে থেকে গেছল। সেই টর্চ্চের আলো ফেলে উন্মত্তের মত আমি চারিদিক পরীক্ষা করে দেখলাম। না, পথ কোথাও নেই, সামনে পেছনে দুদিকেই আমার রাস্তা একেবারে পাথর দিয়ে গেঁথে যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আল্‌গা পাথর সব জায়গাতেই খসে পড়েছে ; ওপরের গুহার ছাদ এখানে সাধারণতঃ যে রকম উঁচু তাতে সে রকম পাথর

ছয় সাত হাত উঁচু ঢিবি হয়ে পড়লেও আমি অনায়াসে তার ওপর দিয়ে টপকে যেতে পারতাম, কিন্তু সামনে ও পেছনে দুটি বাঁকের মুখে সুড়ঙ্গের ছাদ যেখানে অত্যন্ত নীচু হয়ে এসেছে সেইখানেই বড় বড় পাথর ওপর থেকে ধ্বসে পড়ায় সামান্য একটা ইঁদুর গলবার রাস্তাও বুঝি আর ছিল না।

প্রথমটা আমি এই বিপদে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলেও একেবারে আশা ছাড়িনি। ভেবেছিলাম পাথরগুলিকে একটু আধটু নড়িয়ে বেরুবার পথ বোধ হয় আমি করে নিতে পারব। প্রথমে তাঁবুতে ফিরে যাবার পথ যে পাথরের স্তূপে বন্ধ হয়ে গেছল, সেগুলিকে আমি নড়াবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। সে দিকে গুহার একটা বড় অংশই ধ্বসে পড়েছে। অসুরের মত শক্তি নিয়ে জন দশেক লোকও সে পাথর নড়াতে পারে কি না সন্দেহ। পেছনে ফিরবার উপায় না দেখে এবার আমি সামনের দিকেই বেরুবার পথ বার করবার চেষ্টা করলাম। সেদিকে পাথরগুলো তেমন বড় বড় নয়। একটার পর আর একটা যেমন তেমন ভাবে পড়ায় মাঝে মাঝে তার ফাঁকও দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু সেখানেও খানিকক্ষণ ব্যর্থ পরিশ্রমের পর আমি গলদঘর্ম্ম হয়ে উঠলাম, শুধু ক্লান্তিতে নয় ভয়ঙ্কর আতঙ্কে। সত্যিই যে আমার আর বেরুবার উপায় নেই এই জীবন্ত সমাধি থেকে! এদিকের পাথরগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট হলে কি হয় আমার মত একজন লোকের পক্ষে তাদের সরান অসম্ভব।

লোহার শাবলের মত কোন অস্ত্র থাকলেও হয়ত কিছু আশা ছিল। কিন্তু শুধু হাতে কিছুই করবার জো নেই। ক্ষত বিক্ষত হাত নিয়ে দারুণ হতাশায় ও ক্লান্তিতে আমি এবার সেইখানেই বসে পড়লাম। পাহাড়ের এই গোপন সুড়ঙ্গ পথে এরকম ভাবে বন্দী হবার পরিণাম যে কি তা আমি ভালো রকমেই জানি। সঙ্গে কোন রকম খাবার এমনকি জল পর্য্যন্ত নেই। মৃত্যুর সঙ্গে বেশীদিন যুঝতে আমার হবে না এবং তারপর আমার কঙ্কাল পর্য্যন্ত চিরদিন এ পাহাড়ের ভেতর মানুষের দৃষ্টির আড়ালে পচতে থাকবে।

আমার হতাশা তখন এমন গভীর যে পিস্তলটা সঙ্গে থাকলে অনাহারে দীর্ঘ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে শ্রেয় মনে করে আমি হয়ত আত্মহত্যাই করতে পারতাম। কিন্তু পিস্তলটা কোথায় যে ঠিকরে পড়ে পাথর ও বালির আবর্জ্জনায় চাপা পড়েছিল খানিক আগে টর্চ্চ জ্বেলে চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি। টর্চ্চের আলো বেশী খরচ করতেও ভয় হচ্ছিল। ওই আলোটুকুই আমার ভরসা। এই গুহায় এই নিদারুণ অন্ধকারে আলোকটুকুর সান্ত্বনা না থাকলে আমি বোধ হয় খানিকক্ষণের মধ্যে উন্মাদ হয়ে যেতাম। নেহাৎ প্রয়োজন না হলে এবং মাঝে মাঝে নিজেকে আশ্বস্ত করবার জন্যে ছাড়া টর্চ্চটা আমি ব্যবহার করব না ঠিক করেছিলাম। ওপর দিকে আলো ফেলে এর মধ্যে একবার আমি সেদিকে কোথাও কোন বেরুবার পথ আছে কিনা খুঁজে

দেখেছি। গুহার ছাদ মাঝামাঝি জায়গায় বেশ উঁচু। আমার জোরালো টর্চের আলোও সেখানে ভালো পৌঁছায় না, নীচে থেকে মনে হয় ছাদ সেখানে যেন নেই, অন্ধকার রাত্রের আকাশই দেখা যাচ্ছে। খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে কালো পাথরের এবড়ো খেবড়ো চেহারা অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। যাই হোক সেখানে অসংখ্য উড়ন্ত চামচিকে ছাড়া কোন ফোকর আমি দেখতে পেলাম না।

ক্লান্ত হতাশ ভাবে কতক্ষণ আমি বসেছিলাম বলতে পারি না। এই নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের ভেতর সময়ের কোন হিসাব রাখা অসম্ভব। দিন রাত্রি এখানে নেই, নিজের বুকের স্পন্দন ছাড়া আর কোন কিছুর দ্বারা সময় যে বইছে তা এখানে জানা যায় না। ক্লান্তিতে, হতাশায় চোখও আমার বুজে এসেছিল। মনে হচ্ছিল মৃত্যুই যদি হয় তবে ঘুমের মধ্যে অচেতন অবস্থায় তা হওয়াই ভালো।

হঠাৎ আমি চমকে চোখ খুলে তাকালাম। আমার নিজের স্পন্দন শুধু নয়, আরো একটা কি মৃদু শব্দ আমি যেন শুনতে পেয়েছি। ওপরে চামচিকেদের পাখার শব্দও সে নয়। শব্দ আমার অত্যন্ত কাছে।

চোখ খুলে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আতঙ্কে। গুহার মেঝের উপর নীলাভ কয়েকটা আলো যেন নড়ে বেড়াচ্ছে অন্ধকারে।

সত্যিই কি আমার মাথা এর মধ্যেই খারাপ হয়ে গেছে! আমি নিজের চুল ধরে মাথাটাকে ঝাঁকি দিয়ে উঠে বসলাম। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে পাথরের মেঝের সেই সমস্ত আলো গুহা-পথের ধারের ছোট একটি ফাটলের ভিতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমূঢ় ভাবে আমি এবার টর্চ্চটা জ্বাললাম। আতঙ্কে গলা আমার কাঠ হয়ে গেছে। কিন্তু কোথাও কিছু নেই। আমার গুলিতে নিহত গুরালটির মৃত দেহ শুধু পাথর গুলোর ভেতর পড়ে আছে।

সত্যিই কি তাহলে এদেশের লোকেরা যাকে 'নাট' বলে সেই প্রেতমূর্ত্তি আমি দেখেছি। এই বিপদের মাঝেও আমার হাসি পেল। ওসব কোন নাট বা ভূতে আমি বিশ্বাস করি না। না, বিপদ যত বড় হোক এ রকম কুসংস্কারের দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। আমায় যেমন করে হোক্ মাথা ঠিক রাখতে হবে।

কিন্তু আলোটাই বা তাহলে কিসের? আমি টর্চ্চটা নিভিয়ে আবার রুদ্ধশ্বাসে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ কোন কিছুই দেখা গেল না, কোন সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না। তারপর হঠাৎ গুহা-পথের দেয়ালের একটা ফোকরে সেই আলো দেখা গেল। একটি দুটি করে অনেকগুলি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে 'গুরাল'টার মৃতদেহের চারিধারেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মনকে শক্ত করবার চেষ্টা সত্ত্বেও আমার সমস্ত গা শিউরে উঠল! তৎক্ষণাৎ টর্চ্চের বোতাম টিপে দিলাম।

আশ্চর্য্য! টর্চ্চের আলো পড়তেই আলোর বদলে গোটা-কতক ধেড়ে ইঁদুর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে সেই ফোকরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ধেড়ে ইঁদুর দেখে আশ্বস্ত হওয়া দূরে থাক বিস্ময়ই কিন্তু আমার বেড়ে গেল। অন্ধকারে ইঁদুরের গা থেকে আলো বেরোয় এ কথা ত কখনও শুনিনি। টর্চ্চটা নিয়ে আমি ইঁদুরদের ফোকরটার দিকে এগিয়ে এলাম। ফোকরটা বেশ বড়। মেঝের ওপর উপুড় হয়ে তার ভেতরে আলো ফেলে দেখলাম সেটা নীচের দিকে নেমে যায়নি সামনের দিকেই অনেক দূর সোজা চলে গিয়েছে। আর একবার যদি সে ইঁদুরগুলো আসে সেই আশায় একটা পাথর হাতে নিয়ে সেই ফোকরের ধারে এবার অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার নিজের যে জীবন্ত কবর হয়েছে সে বিপদের কথা এই নতুন রহস্যের মীমাংসা করবার উত্তেজনায় তখন আর আমার মনে নেই।

আমার গন্ধ পেয়ে, কিম্বা যে কোন রকমে আমার উপস্থিতি টের পাবার দরুণ, ইঁদুরগুলোর কিন্তু এদিকে বেরুবার আর উৎসাহ দেখা গেল না। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আমি আবার টর্চ্চ জ্বালতে যাচ্ছি এমন সময় স্পষ্ট মানুষের পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম।

এখানে মানুষের পায়ের শব্দ! প্রথমটা অবাক্ হলেও আমার বুঝতে দেরী হ'ল না যে ফোকরের ওধারে আর একটি গুহা-পথ, আমি যে সুড়ঙ্গটিতে আছি তারি গা ঘেঁসে গেছে। মাঝখানে সামান্য খানিকটা পাথরের ব্যবধান।

মানুষের পায়ের শব্দ শুনে প্রথমটা আমি মুক্তি পাবার আশায় তাদের ডাকতে যাচ্ছিলাম কিন্তু সে আহ্বান আমার মুখ দিয়ে বেরোল না। মেঝের ওপর উবুড় হয়ে পড়ে ফোকর দিয়ে আমি অপর দিকে লক্ষ্য রেখেছিলাম। পায়ের শব্দ সেই ফোকরের কাছে আসার সঙ্গে—নীলচে আলোয় সেখানকার অন্ধকার দূর হয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম অপরদিকের পথ দিয়ে যারা পার হয়ে যাচ্ছে তাদের সকলের পা দিয়ে অদ্ভুত একরম নীলচে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

এবার সত্যি আমার মনে হ'ল প্রকৃতিস্থ আমি আর নেই। ভয়ঙ্কর বিপদে কেমন করে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। প্রথমে ইঁদুরের গা দিয়ে এবং তারপর মানুষের পা থেকে আলো বেরুতে দেখার এ ছাড়া আর কোন মানে হতে পারে না। স্বাভাবিক বুদ্ধিতে আমি জানি এ ব্যাপার কখন সম্ভব হতে পারে না। এ নিশ্চয় আমার উন্মত্ত মস্তিকের দুঃস্বপ্ন।

নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভয়ে আমি অস্ফুট চীৎকার করে উঠলাম। এবং সেই চীৎকারের ফলেই আশ্চর্য্য ভাবে আমার মুক্তির উপায় হয়ে গেল।

কাল্পনিক বা বাস্তব প্রাণী যাই হোক আমার চীৎকারের সঙ্গেই ওধারে যারা যাচ্ছিল তারা থেমে পড়ল। ফোকরের ভেতর দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম অনেকগুলি খালি লম্বা লম্বা পা সেখানে তাদের নিজেদের আলোতেই দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ আমার ফোকরের ধারের পাথরে লোহার শাবলের মত কোন অস্ত্রের ঘা শুনতে পেলাম। বুঝলাম তারা পাথর সরিয়ে এ ধারের আওয়াজের কারণ জানবার চেষ্টা করছে। তাদের উত্তেজিত কথাবার্ত্তাও আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। যদিও তার একবর্ণ আমার বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। আমার জানিত কোন ভাষার সঙ্গেই তার সাদৃশ্য নেই।

না, কাল্পনিক প্রাণী এরা নয়। কিন্তু এরা কে? এদের হাতে পড়লে আমি যে আরো বিপন্ন হব না তারই বা নিশ্চয়তা কি? তাদের অস্ত্রের ঘায়ে ফাটলের ধারের একটা পাথর ক্রমশঃ আলগা হয়ে আসছিল। সে পাথরটা সরে গেলে তাদের পক্ষে এগিয়ে আসা আর শক্ত হবে না জেনে আমি কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারলাম না। পাথরটা আলগা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয়ও বাড়ছিল।

একবার হঠাৎ তাদের শাবলটা পাথর থেকে ফস্কে কেমন করে এধারে এসে পড়ল এবং সেই মুহূর্ত্তেই কিছু না ভেবেই আমি সেটা সবলে চেপে ধরলাম। তারপর একটা হেঁচকা দিতেই শাবলটা আমার কবলে এসে পড়ল। ওধারে যে শাবল চালা-

চ্ছিল, সে এরকম ব্যাপারের জন্যে নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিল না। জোর করে শাবলটা টেনে রাখবার সে সময়ই পায়নি।

ওধারে তাদের চেঁচামেচি শুনে বোঝ যাচ্ছিল তারা যেমন বিমূঢ় তেমনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাদের কাছে আর কোন অস্ত্র বোধ হয় ছিল না। অন্ততঃ আর পাথরের উপর কোন ঘা শোনা গেল না।

শাবলটা কেড়ে নেবার সময় সত্যিই আমি নিজের মুক্তির কথা কিছু ভাবি নি। তাদের এদিকে আসতে না দেবার উদ্দেশ্যেই আমি সেটা কেড়ে নিয়েছিলাম। এতক্ষণে আমার মনে হ'ল এই শাবল দিয়েই আমি ত' আমার পথ পরিষ্কার করতে পারি।

একথা মনে হবার পর আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করা যায় না। ওধারের লোকেরা এর পর কি করবে কে জানে! যেমন করে হোক আমায় এখান থেকে বেরুতেই হবে।

পেছনে ফেরার পথ একেবারেই বন্ধ। তাই সামনের দিকে পাথরগুলির ফাটলের ভেতর শাবল চালিয়ে আমি প্রাণপণে এক জায়গায় চাড় দিলাম। শাবল হাতে পড়ায়, উৎসাহের সঙ্গে আমার শক্তিও বুঝি বেড়েছিল। দেখতে দেখতে একটা পাথর সরে গিয়ে সশব্দে অপর দিকে পড়ে গেল। পথ তাতে একেবারে পরিষ্কার হ'ল না বটে, কিন্তু আগেকার দুর্ভেদ্য দেওয়ালে যে ফোকর হ'ল তার ফলে দেখা গেল তার ভেতর দিয়ে কষ্টে স্বষ্টে আমার মত চেহারার লোক গলে যেতে পারে।

শাবলটা প্রথমে ওধারে ফেলে আমি টর্চ্চটা নিয়ে সেই ফোকরের ভেতর দিয়ে কোন রকমে হাত-পা একটু-আধটু ক্ষতবিক্ষত করে অপর দিকে গিয়ে পড়লাম।

সুড়ঙ্গ পথ এখান থেকে বাঁক নিয়ে কোথায় যে গিয়েছে আমি জানি না। হয়ত শাবল যাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি তাদের কাছে গিয়েই আবার পড়তে পারি। কিন্তু আমার তখন তা নিয়ে ভাববার সময় নেই। এগিয়ে আমায় যেতেই হবে।

মাঝে মাঝে টর্চ্চ জ্বেলে পথটা একটু দেখে নিয়ে আমি বেশীর ভাগ অন্ধকারের ভেতরেই ছুটতে লাগলাম! সুড়ঙ্গ পথের অনেক শাখা, অনেক বাঁক। সবশুদ্ধ একটা গোলক ধাঁধার মত। কিন্তু আমি ভাগ্যের উপর নির্ভর করে যখন যেটা উচিত মনে হচ্ছিল, সেইটেই অনুসরণ করছিলাম। কোন রকমে এই দুঃস্বপ্নের বিভীষিকাময় পাহাড় থেকে আমায় বেরুতেই হবে।

কিছুক্ষণ ধরে আমার পায়ের শব্দ ছাড়া আর একটা আওয়াজ আমার মাঝে মাঝে কাণে আসছিল। আওয়াজটা অনেকটা ক্ষুব্ধ গর্জ্জনের মত, কিন্তু কোন প্রাণীর গলা থেকে নিরবিচ্ছিন্ন অমন গর্জ্জন বার হওয়া সম্ভব নয়; তাছাড়া আওয়াজটা আমার এগুবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমান ভাবে বাড়ছিল।

খানিক বাদে একটা বাঁক ফিরতেই আওয়াজটার মানে বোঝা গেল। কিন্তু সেই সূত্রে এমন অপরূপ দৃশ্য দেখবার কল্পনা আমি করিনি।

দশম পরিচ্ছেদ

সুড়ঙ্গ পথ বাঁক নিয়েই যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে পাহাড়ের ভেতরটা কেটে কারা যেন বিশাল এক হল তৈরী করেছে মনে হ'ল। মাঝখানে তার পাথরের মেঝের বদলে প্রকাণ্ড এক জলের কুণ্ড। পাহাড়ের এক ধারের একটি গহ্বর থেকে প্রচণ্ড বেগে জল এসে সে কুণ্ডে পড়ছে। এতক্ষণ এই জলের কল্লোলই আমি শুনেছিলাম। কিন্তু এই জলের কুণ্ড ও প্রপাতের চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার হ'ল এখানকার অদ্ভূত এক নীলাভ আলো। পাহাড়ের গা বেয়ে মোটা পেশীর মত মিশ্-কালো এক রকম পাথর জলপ্রপাতের মুখ থেকে কুণ্ডের ভেতর নেমে গিয়েছে। কুণ্ডের ধারে ধারে অন্য দিকেও সে রকম পাথর আছে। অন্ধকারে সেই পাথরগুলিই যেন জ্বলছে মনে হচ্ছিল।

নিজের বিপদ ভুলে এ দৃশ্য হয়ত আরো খানিকটা আমি দেখতাম কিন্তু সহসা কুণ্ডের ওপারে দৃষ্টি পড়ায় আমি চমকে উঠলাম। আমি যেটি দিয়ে পৌঁছেচি সেটি ছাড়া আরও অনেক সুড়ঙ্গ নানা দিক থেকে কুণ্ডটিতে এসে মিলেছে। ওপারের তেমনি একটি সুড়ঙ্গ-পথের শেষে জলের ধারে দুটি লোক দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ অন্যান্য দিকে দৃষ্টি থাকাতেই তাদের চোখে পড়ে নি। তাদের একজন আমার দিকে পিছন ফিরে নীচু হয়ে কি করছিল, কিন্তু যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল, অস্পষ্ট আলোতেও তাকে চিনতে আমার বিলম্ব হ'ল না। সে লি-সিন।

নিঃশব্দে তৎক্ষণাৎ আমি সেখান থেকে সরে পড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। হঠাৎ লি-সিন মুখ তুলে আমার দিকে তাকালে, এবং সেই সঙ্গে তার কণ্ঠ থেকে যে চীৎকার বেরুল, জলের কল্লোলে খানিকটা চাপা পড়লেও আমার তা ঠিক আদরের ডাক বলে মনে হ'ল না।

পেছন ফিরে আমি পালাবার জন্যে দৌড় দিলাম কিন্তু বেশীদূর সেদিকেও এগুতে হ'ল না।

সামনে অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে অসংখ্য উজ্জ্বল কঙ্কাল আমার দিকে এগিয়ে আসছে! কঙ্কালগুলির ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত নীলচে আলোয় সুড়ঙ্গ-পথ এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে যে ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না।

আমার তখনকার অবস্থাটা বর্ণনা করাও শক্ত। পেছনে আমার বিশাল জলের কুণ্ড ও তার ওপারে পরম শত্রু লি-সিন, আর সামনে রহস্যময় উজ্জ্বল সব কঙ্কালের সারি!

সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে বেছে নেবার উপায় থাকলে আমি বোধ হয় অজানা জলের কুণ্ড ও লি-সিনের সঙ্গে সাক্ষাতের বিপদই পছন্দ করতাম এই ভুতুড়ে কঙ্কালদের সংসর্গের চেয়ে। কিন্তু তখন আর সময় নেই। রহস্যময় কঙ্কালগুলি তখন একেবারে আমার কাছে এসে পড়েছে।

হতভম্ব হয়েই আমি বোধহয় কিছু না করবার খুঁজে পেয়ে, টর্চ্চটা টিপে দিলাম। সেই মুহূর্ত্তে যেন ভোজবাজিতে সে উজ্জ্বল

কঙ্কালের সার মিলিয়ে গেল। তার জায়গায় টর্চের আলোয় দেখা গেল গুহা-পথে অদ্ভূত একজাতের অসংখ্য মানুষের সারি। এদেরি দেহের সমস্ত হাড় থেকে অন্ধকারে অমন অদ্ভূত আলো এতক্ষণ বেরুচ্ছিল। আকারে তারা নিতান্ত ছোট। চার ফুট সাড়ে চার ফুটের বেশী লম্বা তাদের ভেতর কেউ নেই। একলা এরকম গোটা দশেক মানুষকে কাবু করেও আমি বোধহয় বেরিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তারা গোটা দশেক ত নয়, অমন দু'শ লোক গুহা, পথ ও তারপরের রাস্তায় ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা নিরস্ত্রও নয়, অনেকেরই হাতে ছোট বল্লম ও তীর ধনুক দেখা গেল। কয়েকজনের হাতে কলসির মত একরকম মাটির পাত্রও রয়েছে।

আমাকে দেখতে পাওয়া মাত্র তারা সকলে মিলে উন্মত্ত চীৎকার করে উঠ্‌ল। আমার পরিণাম যে এই উন্মত্ত জনতার হাতে কি হবে, তা তখন বুঝতে আমার বাকী নেই, তবু মরবার আগে অন্ততঃ কাপুরুষের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকব না সঙ্কল্প করে আমি তখন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছি! আমার গায়ে প্রথম যে আঘাত করবে শুধু হাতেই অন্ততঃ তাকে আমি সাবাড় করে তবে ছাড়ব।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আমায় আক্রমণ বা অস্ত্র দিয়ে আঘাত তারা কেউ করলে না। চারিদিক থেকে এসে তারা আমায় ঘিরে দাঁড়াল। হাতে তাদের উদ্যত বল্লম, আর বাগিয়ে

ধরা তীর ধনুক দেখে বুঝতে পারলাম আমায় না মেরে বন্দী করাই তাদের উদ্দেশ্য। সে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা আপাততঃ নিষ্ফল জেনেই আমিও কোনরকম প্রতিবাদ করলাম না।

আমাকে মাঝখানে রেখে, এবার তারা সামনের দিকেই এগিয়ে চলল। নিজেদের মধ্যে, আমার অবোধ্য ভাষায়, উত্তেজিত ভাবে কি আলোচনা করতে করতে কুণ্ডের সামনে গিয়েই তারা থামল। চেয়ে দেখলাম লি-সিন বা তার সঙ্গীর কোন চিহ্ন ওপারে নেই। বিপদ বুঝেই হোক বা অন্য যে কোন কারণে তারা একেবারে গা ঢাকা দিয়েছে।

যে অদ্ভুত জাতের মানুষের ভেতর আমি পড়েছিলাম তা'দের সম্বন্ধে ভাববার মত মনের অবস্থা এতক্ষণে আমার হয়েছে। কিন্তু ভেবে কোন কুল কিনারাও পাচ্ছিলাম না। তাদের বামনের মত আকৃতি দেখে, 'দারু' বলেই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু 'দারু'দের হাড়ের ভেতর থেকে এ রকম অদ্ভুত আলো বার হবার কথা ত কখন শুনিনি। এ আলোর অর্থই বা কি? এই রহস্যময় আলোর কথা ভাবতে গেলে সত্যিই সমস্ত ব্যাপারটা এমন আজগুবি হয়ে ওঠে যে নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। সমস্ত ব্যাপারটা মনে হয় ভৌতিক। কোন স্বাভাবিক ব্যাখ্যাই তার খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমার মনে হচ্ছিল জাগ্রত অবস্থাতেই আমি যেন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখছি। তারা আমায় বন্দী করার পরই আমি টর্চ্চটা

নিভিয়ে ফেলেছিলাম। তারাও কি কারণে বলা যায় না আমার হাত থেকে সেটা কেড়ে নেয়নি বা নিতে সাহস করেনি। টর্চ্চ নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত মূর্ত্তিগুলি আবার উজ্জ্বল কঙ্কালে পরিণত হয়ে গেছল। অন্ধকার অজানা গুহা-পথে চারিধারে সেই অগ্নিময় কঙ্কালে বেষ্টিত হয়ে থাকা যে কি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা তা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। বেশীক্ষণ এই সংসর্গে থাকলে মনে হচ্ছিল আমার মস্তিষ্ক, এতক্ষণে যদি না হয়ে থাকে তাহলে, এবার সত্যিই বিকৃত হয়ে যাবে!

তারা আপাততঃ কুণ্ডের কাছে থেমে যা করছিল তাও অদ্ভুত। সেটা তাদের ধর্ম্মের যে একরকম অনুষ্ঠান এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমে সকলের কণ্ঠ থেকে অদ্ভুত একরকম কাঁদুনির মত গান শোনা গেল। তারপর এক এক করে কয়েকটি লোক,—কলসির মত যে মাটির পাত্র তাদের হাতে দেখেছিলাম, তাই মাথায় করে কুণ্ডের ভেতর নেমে গেল। সে কলসি কুণ্ডের জলে ভরে যখন তারা উঠে এল, তখন সমবেত সকলে মাটির ওপর সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে আবার সেই কাঁদুনির মত গান সুরু করেছে। আমি প্রথমটা কিছু বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়েই ছিলাম, কিন্তু তারা কয়েকজন মিলে আমায় একরকম জোর করেই মাটিতে শুইয়ে দিলে। কলসী মাথায় করে উজ্জ্বল কঙ্কালগুলি আমাদের যেমন ইচ্ছে মাড়িয়ে একেবারে এগিয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত কেউ আর উঠল না গানও থামল না।

এবার ফিরে চলার পালা। পাহাড়ের সুড়ঙ্গপথের গলির পর গলি পার হয়ে তারা যে আমায় কোথায় নিয়ে চলেছিল কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আচ্ছন্নের মত তাদের সঙ্গে যেতে যেতে এক সময়ে শুধু মনে হ'ল, কঙ্কালগুলির আলো যেন ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে। তার কারণ বুঝতেও দেরী হল না। সুড়ঙ্গ পথ এইবার নিশ্চয় কোন খোলা জায়গায় শেষ হতে চলেছে। বাইরের আলো ভেতরে এসে পড়ার ফলেই কঙ্কাল-গুলি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হ'তে হ'তে মিলিয়ে গিয়ে মানুষের আকৃতি পেয়ে গেল।

গুহাপথ থেকে তখন আমরা বাইরে বেরিয়ে এসেছি। ভোরের আলোয় সামনে অপরিচিত পাহাড় জঙ্গলের দেশ দেখা যাচ্ছে। নানারকম উত্তেজনায় পাহাড়ের ভেতর সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায় গোটা রাত যে আমার কেটে গেছে এতক্ষণ সে খেয়াল হয় নি।

লাওচেন পাহাড় পেরিয়ে যেখানে পৌছতে চেয়েছিল, এ যে দারুদের সেই গোপন দেশ এ বিষয়ে আর আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এ ভাবে এখানে পৌঁছাতে ত আমি চাইনি। আমার সম্বন্ধে এদের যে কি মতলব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আপাততঃ অদূরের একটা ছোট পাহাড়ের দিকেই তারা আমায় নিয়ে চলেছিল। পাহাড় না বলে তাকে বড় পাথরের ঢিবি বলাই উচিত। কলকাতার মনুমেণ্টের চেয়ে

তার চূড়ো বেশী উঁচু নয়। সেই চূড়োয় কয়েকটা ঘর দেখতে পাচ্ছিলাম।

খানিক বাদে পাহাড় বেয়ে সেখানে উঠে দেখলাম শক্ত বাঁশ দিয়ে তৈরী সেখানে খুপরী খুপরী অনেকগুলি ঘর সারি সারি সাজান। তারই একটায় আমায় ঠেলে ঢুকিয়ে দেবার আগে আমি সমস্ত জায়গাটা কিন্তু ভালো করে দেখে নিয়েছি। পালাবার সুযোগ খোঁজাই ছিল উদ্দেশ্য কিন্তু সে সুযোগ সত্যিই সেখানে নেই। আমরা যে দিক দিয়ে উঠেছিলাম সেই দিকটা ঢালু হলেও পেছনের দিকে পাহাড় খাড়া ভাবে বহুদূরে নেমে গেছে। আমার ঘরটাও একেবারে সেই খাড়াই-এর কিনারায়। দারুদের পাহারা শুধু সামনের দিকেই হলেও পেছন দিয়ে নেমে যাবার কোন আশাই দেখলাম না।

ঘরগুলির মাথায় পাতার ছাওনি দেওয়া। দেওয়ালগুলি শুধু বাঁশের খুঁটিতে তৈরী। তার ভেতর যথেষ্ট ফাঁক আছে। সেই বাঁশের বেড়ার ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম আমার পাশের ঘরগুলিতেও অনেকগুলি লোক পড়ে আছে। তারা দারুদেরই জাতের, কিন্তু অধিকাংশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় তারা একেবারে মৃত্যুর দরজায় এনে পৌঁচেছে। উত্থান শক্তি পর্য্যন্ত তাদের অনেকের নেই, মাটিতে পড়ে তাদের অনেকেই কাৎরাচ্ছে।

তারা কিন্তু আমার মত বন্দী বলে মনে হ'ল না। দারুরা

সসম্ভ্রমে এসে তাদের খুপরির সামনে যে রকম সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে যাচ্ছিল তাতে সে কথা মনে করা শক্ত। রহস্যটা সম্পূর্ণ বুঝতে না পেরে কেমন একটা অজানা আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছিল। গুহা-পথের উজ্জ্বল কঙ্কাল থেকে আরম্ভ করে, এই অদ্ভুত জাতের যা কিছু কাণ্ড কারখানা এ পর্য্যন্ত দেখেছি সমস্তই দুর্ব্বোধ রহস্যময়। এরা যে আমায় নিয়ে কি করবে কিছুই জানি না, কিন্তু কেমন যেন অনুভব করছিলাম, সে পরিণামের চেয়ে মৃত্যু বুঝি লোভনীয়।

এ আতঙ্ক আর একটি কারণে আরও বেড়ে গেল। অনেকক্ষণ ঘরে পড়ে থাকার পর হঠাৎ একটি লোক কয়েকজনের সঙ্গে বাঁশের আগড় খুলে ভেতরে ঢুকল। সাধারণ 'দারু'দের চেয়ে সে অনেক বেশী লম্বা চওড়া; 'দারু'দের মধ্যে তাকে দৈত্য বলেই মনে হয়—কিন্তু সেইটেই তার প্রধান বিশেষত্ব নয়। বিশেষত্ব তার মুখ। এখানকার দারুদের অনেকের মুখেই নানারকম রঙ মাখান, কিন্তু মানুষের মুখ শুধু রঙের ছোপে যে কি ভীষণ হয়ে উঠতে পারে এই লোকটিকে না দেখে বোঝা যায় না। লোকটা আমার কাছে এসে অনেক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল, তারপর হঠাৎ আমায় সবলে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলে। সে মুহূর্ত্তে তার রং করা পৈশাচিক মুখে সবলে একটা ঘুঁসি মারবার লোভ আমি যে কি করে সম্বরণ করেছিলাম বলতে পারি না। লোকটা শুধু আমায় দাঁড় করে দিয়েই ক্ষান্ত

হ'ল না, এতক্ষণ কেউ যা করেনি তাই সে করে বসল। হঠাৎ আমার হাত থেকে টর্চ্চটা টেনে ছিনিয়ে নিয়ে সে আমায় সবলে একটা ধাক্কা দিলে। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে আমি পড়ে গিয়েছিলাম। উঠে তার দিকে উন্মত্তভাবে ছুটে যাবার আগেই আর সকলের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে সে আগড় বন্ধ করে দিলে। তার সেই মুহূর্ত্তের হাসি কোনদিন ভোলবার নয়। সে হাসি ভয়ঙ্কর কিনা আমি বলতে পারি, না কিন্তু তখন মনে হয়েছিল অমন অদ্ভুত হাসি মানুষের কণ্ঠ থেকে যেন বেরোতে পারে না।

এর পরেও কয়েকবার আমার ঘরের সামনে দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইতে চাইতে তাকে যাতায়াত করতে সে-দিন দেখেছিলাম, কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি আমার ভাগ্যের উপর কতখানি হাত তার সেদিন আছে।

বুঝতে পারলাম রাত হবার পর। সারাদিন অনাহারের পর আমার মাথা তখন ঝিম ঝিম করছে। তারই ভেতর অবাক হয়ে দেখলাম আমার পাশের সমস্ত ঘরে মানুষ আর নেই। উজ্জ্বল কঙ্কাল শুধু পড়ে আছে সারি সারি। গুহা-পথের অন্ধকারে যে সব কঙ্কাল দেখেছিলাম তার চেয়েও এদের জ্যোতি অনেক বেশী প্রখর। মনে হয় যেন জ্বলন্ত ইস্পাৎ দিয়ে সেগুলি তৈরী!

বাইরে অন্ধকারে অনেক লোকের হট্টগোল শুনতে পাচ্ছিলাম। খানিক বাদে একটা মশাল সেখানে জ্বলে উঠল। দেখলাম পাহাড়ের খাড়াইএর ঠিক সামনেই একটা প্রকাণ্ড মোটা

খুঁটি পোতা। তার সামনে বেদীর মত খানিকটা উঁচু জায়গায় মশালের আলোয় অনেকগুলি দারুকে দেখা গেল। তাদের চারিধারে খানিকটা দূরত্ব রেখে আরো অসংখ্য দারু দাঁড়িয়ে আছে। মশালের রাঙা অস্পষ্ট আলোয় তাদের দেখাচ্ছে অদ্ভুত।

কোন পৈশাচিক অনুষ্ঠানের জন্যে যে তারা প্রস্তুত হচ্ছে তা বোঝা কঠিন নয়। যখন কয়েকজন মিলে উদ্যত বল্লাম হাতে এসে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সেই বেদীতে দাঁড় করিয়ে দিলে তখন একথাও বুঝলাম যে আমিই সেই অনুষ্ঠানের প্রধান উপকরণ।

কিন্তু কি সে অনুষ্ঠান? রক্তাক্ত যুপকাষ্ঠ বা খড়্গ নয়, উত্তপ্ত তেলের কড়াইও নয়! সাধারণতঃ যে সব জিনিষ অসভ্য জাতিদের পৈশাচিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে আমরা জড়িত থাকে বলে মনে করি, সে সব কিছুই সেখানে নেই। বেদীর ওপর একটি গর্ত্তের ভেতর মশালটি পোঁতা। একটি কলসি জল ছাড়া আর বেদীর ওপর কোন জিনিষও নেই। শুধু বেদীর পেছনে খাড়া পাহাড় আর বেদীর উপর দারুদের সেই রঙমাখা দৈত্যের উপস্থিতি ছাড়া ভয় করবার আমি আর কিছু দেখতে পেলাম না। দারুদের দৈত্যের দৃষ্টি তখনও আমার মুখের ওপর অদ্ভুত ভাবে মাঝে মাঝে অনুভব করছিলাম। সে দৃষ্টি দুর্বোধ্য! বুঝতে পারছিলাম না কি এদের মতলব! এরা কি তাহলে এই খাড়া পাহাড় থেকে আমায় নীচে ফেলে দিতে চায়! তাদের নরবলির রীতি কি এই?

বেশীক্ষণ দ্বিধায় থাকতে কিন্তু হবে না মনে হ'ল। অনুষ্ঠান এর মধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। পেছনের খুঁটিতে আমায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে দুজন শীর্ণকায় দারু কি এক রকম শব্দ উচ্চারণ করতে করতে আমার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চারিধারে অসংখ্য দারুও কাঁদুনি সুরে অদ্ভুত এক রকম আবৃত্তি সুরু করে দিলে।

ব্যাপারটা এখন একটু একটু আমি বুঝতে পারছি না এমন নয়। এরা আমায় দেবতা হিসাবে পূজা করছে, বলির আগে ছাগলকে যেমন করা হয়। কিন্তু পূজার পর কি হ'বে? ভীত ভাবে আমি একবার পেছনের অতল খাদ ও সামনের সেই দারু-দৈত্যের মুখের দিকে তাকালাম। আমার পাশেই আমাকে পাহারা দেবার জন্যেই যেন সে দাঁড়িয়েছিল। সে মুখে কোন ভাবান্তর নেই—রঙের পৈশাচিকতা ছাড়া।

কিন্তু আমায় ধরে পাহাড় থেকে ফেলে দেবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। খানিক বাদে আবৃত্তি থামতেই কাঠের একটি বাটির মত পাত্রে একজন বুড়ো দারু কলসী থেকে জল ঢেলে সসম্ভ্রমে আমার কাছে নিয়ে এল। সমবেত দারুরা তখন মাটিতে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে আবার নূতন রকম আবৃত্তি আরম্ভ করেছে।

অনুষ্ঠানের শেষে যাই থাক আপাততঃ তার এই অঙ্গটুকুতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। সমস্তদিন নির্জ্জলা উপোষে

এবং ভয়ে ভাবনায় আমার গলা তখন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কৃতজ্ঞ হয়েই আমি সে জলের জন্যে হাত বাড়ালাম।…

…আর সেই মুহূর্ত্তেই অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড ঘটে গেল। জলের পাত্র আমি মুখে তুলতে যাচ্ছি হঠাৎ দৈত্যাকার সেই দারুর প্রকাণ্ড এক চড়ে জলের পাত্র আমার হাত থেকে ছিট্‌কে পড়ে গেল। আমি বিমূঢ় হয়ে মুখ তুলতে না তুলতেই দেখি বেদীর ওপর থেকে মশালটা উপড়ে নিয়ে সে সজোরে পাহাড়ের ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। উল্কার মত অতল শূন্যে মশালটা অদৃশ্য হতেই রাতের অন্ধকার যেন বন্যার মত আমাদের ওপর নেমে এল। চারিধারে শুধু অসংখ্য উজ্জ্বল কঙ্কালের জ্যোতি।

সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে স্পষ্ট বাঙ্গলায় শুনতে পেলাম—"শীগগীর দড়ি ধরে পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে নেমে যাও। পেছনের খুঁটিতে দড়ি বাঁধা আছে।"
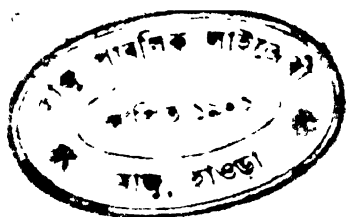
একাদশ পরিচ্ছেদ

সে ভাষা, সে স্বর এমন অপ্রত্যাশিত যে প্রথমটা আমি আরো বিমূঢ় হয়ে একেবারে স্থানুর মতই দাঁড়িয়ে রইলাম। সব কিছু যেন আমার গুলিয়ে গেছে। ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত যে কথাগুলোর সোজা অর্থ যেন আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না।

পর মুহূর্ত্তেই আবার ধমকানি শোনা গেল—"হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নয়। শীগগীর নেমে যাও।"

এবার আর আমার অসাড়তা রইল না। সত্যিই সময় যে নিতান্ত অল্প। পালাবার এমন সুযোগ পেয়েও কি হারাব! বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত চমকে উঠে আমি নীচু হয়ে বসে পড়ে অন্ধকারে খুঁটির গোড়ায় হাত দিলাম। সেখানে সত্যিই মোটা একটা দড়ি শক্ত করে বাঁধা রয়েছে। সেই দড়ি ধরে পাহাড়ের ধার থেকে নীচে ঝুলে পড়া তিন সেকেণ্ডের কাজ। যদি যথেষ্ট লম্বা হয় তাহলে তা ধরে পাহাড়ের খাড়াইটা যে অনায়াসে নেমে যেতে পারব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু দড়ি ধরে পাহাড়ে পা ঠেকিয়ে নেমে যেতে যেতে হঠাৎ আমি থেমে গেলাম।

ওপরে এরি মধ্যে উত্তেজিত হট্টগোল সুরু হয়ে গেছে। সমবেত জনতা এতক্ষণে বুঝি প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছে।

চীৎকার করে বল্লাম, "মামাবাবু, তুমি কি করবে ?"

অন্ধকারে মামাবাবুর স্বরই যে শুনেছিলাম এ বিষয়ে আমার অবশ্য কোন সন্দেহ ছিল না। গলার স্বর সম্বন্ধে ভুল করা যদি বা সম্ভব হয় এই অজানা দারুদের দেশে বাঙ্গালা যে আর কেউ বলতে পারে না এটা ঠিক।

চারিধারের উত্তেজিত কলরবের ভেতর মামাবাবুর গলা আবার শোনা গেল,—"দেরী করে সমস্ত মাটি করলে আহাম্মুখ! আমার জন্যে ভাববার আর সময় পেলে না! আমি তোর পরেই যাচ্ছি, তুই তাড়াতাড়ি নেমে যা।"

বকুনি খেয়ে আমি আর বিলম্ব করতে সাহস করলাম না। দড়ি ধরে পাহাড়ে পা ঠেকিয়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি নেমে যেতে লাগলাম। কিন্তু মন আমার কিছুতেই আশ্বস্ত হচ্ছিল না।

মামাবাবু যে ওই উত্তেজিত দারুদের ভেতর কত বড় বিপদের মধ্যে আছেন তা বোঝা আমার পক্ষে শক্ত নয়। তাদের হাত ছাড়িয়ে তিনি নেমে আসবার সুযোগ পাবেন কিনা কে জানে! এই অবস্থায় শুধু নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে নেমে যেতে কিছুতেই আমার মন সরছিল না।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে নামতে নামতে হঠাৎ ওপরে বন্দুকের শব্দ শুনে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আর একটু হলেই দড়ি থেকে হাত খুলে গিয়ে আমি নীচে পড়ে গেছলাম আর কি!

কোন রকমে সে বিপদ সামলে নেবার পর আমি কিন্তু আর নামতে পারলাম না। বন্দুক যখন ছুঁড়তে হয়েছে তখন ব্যাপার কতদূর গড়িয়েছে কে জানে! মামাবাবু একা সমস্ত দারুদের বিরুদ্ধে কি করতে পারবেন! তারা সবাই মিলে শুধু ঠেলেই তাঁকে এই পাহাড় থেকে ত ফেলে দিতে পারে।

কথাটা মনে হতেই আর নিশ্চেষ্ট হয়ে নেমে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। আমি নিজেও নিরস্ত্র। এভাবে একলা মামাবাবুর সাহায্যে গিয়ে কিছু করতে পারব না জেনেও আবার দড়ি ধরে ওপরে না উঠে পারলাম না।

কিন্তু বেশী দূর উঠতে আমায় হ'ল না। হঠাৎ দড়িতে একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলাম। এবং তারপর একটা টর্চ্চের আলো এসে পড়ে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিলে!

মামাবাবু ওপর থেকে চীৎকার করে বল্লেন,—"একি! এতক্ষণে এইটুকু নেমেছিস্। তাড়াতাড়ি আরো তাড়াতাড়ি। আমি আসছি।"

টর্চ্চের আলো নিভিয়ে মামাবাবু এইবার নামতে সুরু করলেন। আমার কাছে তিনি না আসা পর্য্যন্ত কিন্তু আমি থেমেই রইলাম।

মামাবাবু আমার কাছে পৌঁছবার পর বকুনি দেবার আগেই বল্লাম,—"কিছু বোলোনা মামাবাবু! তোমায় বিপদের মধ্যে রেখে একলা নেমে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখন

বাঁচলে দুজনেই বাঁচব। পাহাড় থেকে পড়ে মরতে হয় দুজনেই মরব।”

“আচ্ছা খুব বাহাদুরী হয়েছে, এখন তাড়াতাড়ি চল!”

আমাদের আর কোন কথাবার্ত্তা অনেকক্ষণ হ'ল না। দুজনে পরপর দড়ি ধরে খাড়া পাহাড়ের গায়ে যথাসম্ভব পায়ের ভর দিয়ে নেমে যেতে লাগলাম। কাজটা নিতান্ত সোজা যে নয় তা বলাই বাহুল্য। খাড়া পাহাড় কতদূর পর্য্যন্ত নেমে গেছে কে জানে। পায়ের ভর দেওয়ার ক্রমশঃই আর সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। হাতের ওপর অসম্ভব ভার পড়ছিল। মোটা ঘাসের দড়িতে হাতের চামড়া যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল। যত এগিয়ে যাচ্ছিলাম ততই মনে হচ্ছিল শেষ যেন আর নেই।

চারিধারে সূচীভেদ্য অন্ধকার। তাতে অবশ্য একটু সুবিধেই হয়েছিল। ওপরের দারুরা আমাদের দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু পাহাড় থেকে কি রকম অবস্থায় শূন্যে কোথায় ঝুলছি বুঝতে না পেরে অস্বস্তিও হচ্ছিল ভয়ানক।

ওপরে পাহাড়ের ঠিক কিনারে গণ্ডগোল ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে শুনতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমাদের দড়িটা প্রচণ্ড বেগে নড়ে

থেমে পড়ে ভীতস্বরে বল্লাম,—“ব্যাপার কি?”

মামাবাবু শান্তস্বরে বল্লেন,—“থামিস নি, ওরা দড়িটার কথা এইবার জানতে পেরেছে।”

এই অবস্থায়ও মামাবাবুকে শান্ত থাকতে দেখে সত্যি অবাক্ হয়ে গেলাম। নামতে নামতে বল্লাম,—"তাহলে উপায় ?"

"উপায় আরও জোরে হাত চালান !"

কিন্তু, হাত যে আর চলতে চায় না। মনে হচ্ছিল দড়িটা যেন কেটে হাতের ভেতর বসে যাচ্ছে ! সমস্ত বাহু অসাড় হয়ে শরীরের ভার আর যেন বইতে পারচে না।

মামাবাবু হঠাৎ সেই অবস্থায় টর্চটা জ্বেলে উপরে ফেল্লেন। পাহাড়ের ধারে অসংখ্য দারু ঝুঁকে পড়ে নীচের দিকে আমাদের দেখবারই বোধহয় চেষ্টা করছিল। টর্চের আলো দেখেই তারা চীৎকার করে উঠল। কিন্তু সে চীৎকারে নয়, সেখানকার জনতার ভেতর একটা ব্যাপার দেখে আমার সমস্ত শরীর যেন সহসা হিম হয়ে গেল।

ভীত উত্তেজিত স্বরে বল্লাম, "মামাবাবু ওরা কি করছে জানেন ?"

"—কি ?"

আমাদের দড়ি কাটছে যে !"

টর্চের আলো নিভিয়ে তেমনি শান্তস্বরে মামাবাবু বল্লেন,—"কাটুক, ভয় নেই।"

ভয় নেই ! আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বল্লাম,—"হ্যাঁ ভয় আর কি। সমস্ত শরীরটা গুঁড়ো হয়ে যাবে এই যা ! এর চেয়ে ওপরে দাঁড়িয়ে থেকে সসম্মানে যুঝে মরতে পারতাম !"

মামাবাবুর কিন্তু কোম রকম উত্তেজনা দেখা গেল না। শুধু বল্লেন,—"না, মরতে হবে না, আমরা নীচে না পৌঁছালে ও দড়ি কাটা পড়বে না। একটু হাত চালা।"

হাত চালান ছাড়া আর কি করা যায়! কিন্তু আমি তখন সমস্ত আশা পরিত্যাগ করেছি। মামাবাবুর প্রশান্তিতে শুধু অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হচ্ছিল। বল্লাম,—"কাটা যে পড়বে না তা জানলে কেমন করে? ওদের ছুরিও কি ভোঁতা?"

"না ভোঁতা নয়, কিন্তু ছুরী চালাচ্ছে মঙ্‌পো!"

"মঙ্‌পো!"

"হ্যাঁ মঙ্‌পো! মাথায় দারুদেরই প্রায় সমান বলে তাদের ভেতর থেকে ওকে চেনা যায় না। মঙ্‌পো আমার সঙ্গেই ছিল বরাবর।"

আমার মুখ দিয়ে অস্ফুটভাবে বেরুল শুধু—"কিন্তু মঙপো দড়ি কাটছে কেন?"

মামাবাবু সংক্ষেপে শুধু বল্লেন—"আহাম্মুখ, তা না হ'লে ওদের কেউ-ই যে কাটত!"

ঠিক দরকারের সময় মঙ্‌পো কেমন করে যথাস্থানে এসে উদয় হ'ল, মামাবাবুই বা কেমন করে এমন ভাবে এসে আবির্ভূত হলেন, সেই ভয়ঙ্কর রাতের পর তাঁদের কি পরিণাম হয়েছিল, এতদিনই বা কি করেছিলেন এ সমস্ত জানবার কি অদম্য কৌতূহল যে তখন হচ্ছিল তা বোধহয় আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। সমস্ত

ব্যাপারটা একটা প্রহেলিকার মত—সত্য বলে বিশ্বাস করাই যায় না, কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্তি করবার সময় এখন নয়। হাতের মাংস দড়ির ঘর্ষণে কেটে ওরাণ হয়ে যাচ্ছে, দুটো কাঁধ যন্ত্রণায় মনে হচ্ছিল যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে! সমস্ত দিন অনাহারে থাকবার দরুণই আরো বেশী ক্লান্ত যে হয়ে পড়েছিলাম এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এমনভাবে কতক্ষণ আর দড়ি ধরে থাকবার জোর গায়ে থাকবে তা বুঝতে পারছিলাম না। ওপরে মঙ্‌পো চালাকী করে উন্মত্ত দারু-দের বা কতক্ষণ আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে! না, এত করেও বুঝি কিছু হ'ল না। সমস্ত হাত অসাড় হয়ে আসছে, হাতের শিথিল মুঠির ভেতর দিয়ে দড়ি যেন পিছলে যাচ্ছে বুঝতে পারছিলাম।

মনের হতাশা মুখ থেকে আপনা থেকেই প্রকাশ পেয়ে গেল।—"আর পারছি না মামাবাবু! হাতে আর সাড় নেই।"

মামাবাবুর উত্তর শুনে কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম। তিনি বল্লেন—"ছেড়ে দে তা হলে হাত।"

প্রাণের মায়া বড় সামান্য জিনিষ নয়। সত্যিই তখনও আমি প্রাণপণে দড়ি ধরে থাকবারই চেষ্টা করছি। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম,— "ছেড়ে দেব? বাঃ বেশ ত তুমি! এই পাহাড়ে আমার গুঁড়ো হওয়াই তুমি চাও?"

"না রে গুঁড়ো হবি না, আর হাত তিনেক মাত্র আছে। আমি গুণে গুণে আসছি। অনায়াসে ছাড়তে পারিস্।"

মামাবাবুর কথা শেষ হবার আগেই শক্ত পাথরের ওপরে আমি হাত ছেড়ে দিয়ে পড়েছি। আঘাত অবশ্য একটু লাগল, কিন্তু নিরাপদে মাটিতে পা দেওয়ার আনন্দ ও হাতের যন্ত্রণা শেষ হওয়ার আরামের কাছে সে আঘাত কিছুই নয়।

মামাবাবু আমার পরেই অন্ধকারে সেখানে এসে নেমে বেগে দড়িটাকে একটা ঝাঁকানি দিলেন টের পেলাম। তার কয়েক মুহূর্ত্ত বাদেই দড়িটা ওপর থেকে কাটা হয়ে সশব্দে আমাদের পায়ের কাছে পড়ল। দড়িটা অমন ভাবে কাটা হয়ে না পড়লে হয়ত আমাদের জীবন কি ভয়ঙ্কর ভাবে বিপন্ন হয়েছিল ভাল করে বুঝতে পারতাম না। আর মিনিট খানেক আগেও দড়ি কাটা পড়লে আমাদের আর চিহ্ন থাকত না।

ওপরের দারুরা ইতিমধ্যে কয়েকটা মশাল সেখানে জ্বেলে ফেলেছে। দড়ি কাটা পড়বার পর নীচের দিকে মশাল ঝুলিয়ে পাহাড়ের ধার থেকে ঝুঁকে পড়ে তারা ফলাফলটা দেখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে চেষ্টা তাদের বৃথা। তাদের মশালের আলো এই গাঢ় অন্ধকারে কতদূর আর পৌঁছবে।

আমি তাই জন্যে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে এই দারুণ শক্তি পরীক্ষার পর একটু জিরোবার কথাই বুঝি ভাবছিলাম। দারুরা আপাততঃ আমাদের আর কোন ক্ষতি করতে পারে না। সুতরাং একটু দম নিলে ক্ষতি কি! বিশেষ করে মনের ভেতর যত প্রশ্ন জমে আছে, তাদের কয়েকটার উত্তর না পেলে যে স্থিরই থাকতে পারছি না।

কিন্তু মামাবাবু আমায় সে অবসর দিলেন না। পাহাড়ের ধারে মশালের আলো দেখা যেতেই তিনি আমার হাত ধরে টান দিয়ে প্রাণপণ বেগে নীচে নামতে স্বুরু করলেন।

অন্ধকারে পাহাড়ের এবড়ো খেবড়ো পাথরের ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি নামা সোজা কথা নয়। পদে পদে হোঁচট লাগছিল। আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি এমন সময় মামাবাবু যে মিছিমিছি পালাবার জন্যে ব্যস্ত হ'ননি তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আমাদের হাত দুয়েক দূরে সশব্দে একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই তখন পড়েছে। সে পাথরের পর ছোট বড় আরো অনেক পাথর এবার নীচে এসে পড়তে লাগল। কি ভাগ্যি আমরা তখন পাহাড়ের আরেক দিকে সরে গেছি মামাবাবুর উপস্থিত বুদ্ধির জোরে। নইলে সেই একটি পাথর মাথায় পড়লেই আর আমাদের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেত না।

দারুরা এতক্ষণ যে কেন এ উপায় অবলম্বন করেনি কে জানে। তাহলে মঙ্পোর সমস্ত চাতুরী সত্ত্বেও দড়ি বেয়ে নীচে নামা আর আমাদের ভাগ্যে হ'ত না। সম্ভবতঃ আমাদের মারবার জন্যে দড়ি কাটাই যথেষ্ট মনে করে তারা এতক্ষণ নিশ্চিন্ত ছিল। অন্য কোন উপায়ের কথা তাদের মাথায় খেলেনি।

উচু নীচু এবড়ো খেবড়ো পাথরের ওপর দিয়ে চলতে হচ্ছে। অন্ধকারে টর্চ্চ জ্বেলে পথ দেখবার উপায় নেই, কারণ তাহলে আমরা কোথায় আছি দারুদের আর জানতে বাকী থাকবে না।

অনেকক্ষণ বাদে মামাবাবু যখন থামলেন তখন বারবার হোঁচট খেয়ে ও পড়ে গিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে। দম ফিরে পেতেও আমাদের কম সময় লাগলে না। কিন্তু এত কাণ্ডের পর এমন ভাবে মিলিত হয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় এলেও মামাবাবুকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করবার অবসরও আমি পেলাম না।

প্রথমেই মামাবাবু বল্লেন—"এইবার কিন্তু ছাড়াছাড়ি দরকার।"

বিস্মিত যত হলাম, তার চেয়ে ক্ষুণ্ণ হলাম যে বেশী, একথা বলাই বাহুল্য। জিজ্ঞাসা করলাম—"কেন?"

মামাবাবু একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বল্লেন—"তর্ক করবার সময় নয়। যা বলছি তাই কর।"

কিন্তু তবু আমি জেদ করাতে মামাবাবু আমায় বুঝিয়ে যা বল্লেন তা যুক্তিযুক্ত হলেও মনঃপুত কিছুতেই আমার হ'ল না। মামাবাবুকে মঙ্পোর জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে। মামাবাবু ও মঙ্পোর এ অঞ্চল পরিচিত, তাঁরা কোন রকমে আলাদা হয়েও দারুদের এড়াতে পারবেন, কিন্তু আমি সঙ্গে থাকলে বিপদ বাড়বে। আমায় তাই আগে থাকতে তিনি নিরাপদ জায়গায় পাঠাতে চান। দারুরা এখনো আমাদের সন্ধানে চারি ধারে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। এই বেলা অন্ধকারে আমার চলে যাওয়ার সুবিধা আছে।

সব কথা শুনে বল্লাম—"তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু যাব কেমন করে! এ অঞ্চল যে চিনি না, তাত নিজেই বলছ।"

মামাবাবু হেসে বল্লেন—"যেখানে যেতে বলছি সে জায়গা অন্ততঃ তুই চিনিস্।"

"আমি চিনি!"

"হ্যাঁ, যে সুড়ঙ্গ থেকে দারুদের সঙ্গে বেরিয়েছিলি সেটা মনে আছে ত!"

"সেখানে আবার কেন?"

"সেখানেই আমাদের আস্তানা।" বলে মামাবাবু এবার সেই সুড়ঙ্গ-পথের গোলক ধাঁধার ভেতর কোথায় একটি গোপন গুহার মত স্থানে তিনি আস্তানা করেছেন তা খুঁজে নেবার উপায় বুঝিয়ে দিলেন।

অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করবার ছিল কিন্তু মামাবাবু একেবার অটল। মামাবাবুর দেওয়া টর্চ্চটা নিয়ে অত্যন্ত অপ্রসন্ন ভাবেই তাই এগিয়ে যেতে হ'ল।

নিরাপদ বলে যেখানে আমায় পাঠাবার জন্যে মামাবাবুর এত আগ্রহ, সেখানে কি বিপদ অপেক্ষা করছে মামাবাবু যদি তখন জানতেন!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মামাবাবু একটা কথা ঠিকই বলেছিলেন। বিশাল একটা পাহাড় খুঁজে বার করা বিশেষ কঠিন নয়, মামাবাবু যে রকম নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন তাতে ঘণ্টা খানেক হাঁটবার পর সুড়ঙ্গ পথও পেয়ে গেলাম। কিন্তু সুড়ঙ্গ পথের মুখে এসে কেন বলা যায় না প্রথমটা থমকে দাঁড়াতেই হ'ল। মনে যতই জোর করি না কেন, গা'টা আপনা থেকেই তখন ছম্ ছম্ করছে। এই পাহাড়ের সুড়ঙ্গগুলির মধ্যে যে সব অদ্ভূত ব্যাপার আমি এক রাত্রে দেখেছি তা ভোলা সহজ নয়। সুড়ঙ্গগুলি সত্যই দুর্বোধ্য রহস্যে আমার কাছে বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে।

শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য ঢুকতেই হ'ল। এতক্ষণ বাইরের খোলা জায়গায় আমি টর্চ্চ ব্যবহার করিনি বল্লেই হয়। সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকেই কিন্তু সেটা জ্বেলে ফেল্লাম। মামাবাবু যে রকম বলে দিয়েছিলেন তাতে বেশীদূর আমার যাবার দরকার নেই। সুড়ঙ্গের কয়েকটা বাঁকা পথ ঠিকমত ঘুরেই পাথরের দেয়ালে একটা ফাটল দেখা যাবে। সেই ফাটলের একধারে একটু চাপ দিলেই কব্জা দেওয়া দরজার মত পাথরটা ঘুরে গিয়ে একটি সঙ্কীর্ণ পথ বেরিয়ে পড়বে। তার ওধারেই মামাবাবুর আস্তানা।

মনের সন্ত্রস্ত অবস্থায় পথ ভুল করবার জন্যে বা মামাবাবুর নির্দ্দেশের ত্রুটির দরুণ,—যে কারণেই হোক পাথরের দেয়ালের সে ফাটল কিন্তু আধঘণ্টা ধরে খুঁজে হায়রাণ হয়েও আমি পেলাম না। দেরি হবার সঙ্গে অধৈর্য্য আমার বাড়ছিল। সুড়ঙ্গের গলির পর গলি ঘুরে তখন আমি বার হবার রাস্তাও গুলিয়ে ফেলেছি। এই পাহাড়ে আগের এক রাতের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে শুধু পরিশ্রমে নয় ভয়েও শীতের রাত্রে আমার কপাল ঘেমে উঠেছে। ভয় আমার অমূলকও নয়। এ অবস্থায় কি করা উচিত ঠিক করবার জন্যে একটি দুমুখো গলির মোড়ে দাঁড়িয়েই আমি চমকে উঠে টর্চ্চটা নিভিয়ে দিলাম। সুড়ঙ্গের মধ্যে স্পষ্ট পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আমি আলো নেভাবার পরই সে পায়ের শব্দ থেমে গেছল কিন্তু তাতে আশ্বস্ত হবার কিছুই নেই! মানুষ বা পশু যার পায়ের শব্দই শুনে থাকি না কেন, সে যে আমার উপস্থিতি টের পেয়েছে এবং পালাবার চেষ্টা যে তার নেই, এটুকু পায়ের শব্দ থামা থেকে অনায়াসেই বোঝা যায়।

অত্যন্ত সন্তর্পণে নিশ্বাস নিতে নিতে আমি যেদিক থেকে শব্দ এসেছিল তার উল্টো দিকে নিঃশব্দে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলাম। উপবাসী শরীরের এই ক্লান্ত অবস্থায় কারুর সঙ্গে সম্মুখ-সমরে নামবার উৎসাহ যে আমার তখন ছিল না একথা লজ্জার মাথা খেয়ে স্বীকার করছি। পালানই তখন আমার উদ্দেশ্য।

কিন্তু আমি নড়বামাত্র মনে হ'ল অন্ধকারে আর একজনও নড়ছে। এই সুড়ঙ্গের মধ্যে আমার কোন পরমবন্ধু যে এভাবে আমার পিছু নেয়নি তা বুঝতে আমার দেরী হ'ল না। কিন্তু সে কে! দারুদের কেউ হ'লে সম্ভবতঃ অন্ধকারে তার অস্তিত্ব গোপন থাকত না। অবশ্য দারুদের সবার গা থেকেই আলো বেরোয় না এবং আমার আততায়ী তেমন একজন সাদাসিদে দারুও হতে পারে। ক্ষীণকায় একজন দারুকে হয়ত এই দুর্ব্বল শরীরে কাবু করতেও পারি। কিন্তু সে যে দারু তারই নিশ্চয়তা ত কিছু নেই। ভরসা করে এগিয়ে যাওয়া তাই উচিত মনে হ'ল না।

ব্যাপারটা এতক্ষণে সত্যি শিকার ও শ্বাপদের পাঁয়তাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে আমি নিঃশব্দে তাকে এড়াবার চেষ্টা করছি, সেও আমাকে বাগে পাবার সুযোগ খুঁজছে।

সুড়ঙ্গের ভেতর পায়ের শব্দও ঠিক মত সব সময়ে বোঝা যায় না। তার জন্য সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আমার হচ্ছিল। আমি তার অবস্থান যেমন ভুল করছিলাম, সেও তেমনি সঠিকভাবে আমি কোথায় আছি বুঝতে পারছিল না।

কিন্তু এই সাংঘাতিক খেলা আর কতক্ষণ চালান যায়। ক্রমশঃই আমি হতাশায় মরিয়া হয়ে উঠছিলাম। হঠাৎ একবার আলো জ্বেলে পথটা দেখে নিয়ে সোজা দৌড় দেবার চেষ্টা করব কিনা ভাবছি, এমন সময়ে কে আমার গায়ের ওপর সজোরে লাফিয়ে এসে পড়ল।

অন্ধকারে তার তাগ অবশ্য ঠিক হয় নি। তা না হ'লে এ-কাহিনী আমায় আজ লিখতে আর হ'ত না। প্রথমটা পড়ে গেলেও বিদ্যুৎবেগে তাকে ঝাঁকানি দিয়ে ফেলে আমি উঠে পড়ে চর্চ্চটা জ্বেলে ফেল্লাম। এখন আর অন্ধকারকে ভয় করবার কিছু নেই।

কিন্তু একি! যে ধারাল বড় ছুরিটা তখনও পাথরের ওপর পড়ে ঝক্-ঝক করছে, তার কথাও আমি সে মুহূর্ত্তে ভুলে গেলাম।

আমার সামনে লাওচেন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু সে রাত্রে আমার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ওইখানেই শেষ হবার নয়।

লাওচেন খানিক বাদে যেন নিজেকে সামলে সবিস্ময়ে বল্লে—"একি তুমি! আমি যে লি-সিন ভেবেছিলাম।"

"লি-সিন!" আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—"লি-সিনকে তুমি চেন নাকি?" লাওচেন একটু হেসে বল্লে,—"তা চিনি বই কি!" তাদের দুজনের পরিচয়ের ইতিহাস জানবার জন্যে কিন্তু তখন আমার কৌতূহল নেই। বল্লাম,—"লি-সিনের প্রতি তোমার অনুরাগ এত বেশী আমি অবশ্য জানতাম না। কিন্তু তাকে দেখলে কোথায়?"

"এই সুড়ঙ্গের ভেতরই খানিক আগে। আমি তার পেছু পেছুই অনুসরণ করছিলাম। হঠাৎ একজায়গায় এসে সে যেন ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর খুঁজতে খুঁজতে

হঠাৎ এখানে আলো নিভতে দেখে আমি তাকে পেয়েছি ভেবে নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম।"

লি-সিন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে শুনেই কিন্তু আমার চিন্তার স্রোত অন্য দিকে বইতে সুরু করেছে। লি-সিনের এই অদৃশ্য হওয়ার ভেতর কত বড় বিপদের ইঙ্গিত আছে বুঝে উত্তেজিত ভাবে বল্লাম—"লি-সিন অদৃশ্য হয়ে গেছে—কি বলছ?"

"হ্যাঁ, সত্যিই আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমিও তখন একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছলাম। একটা জলজ্যান্ত মানুষ একেবারে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আমি তার খুব বেশী পেছনে ছিলাম না। আমি যে তাকে অনুসরণ করছি সে কথা সে জানতে পেরেছিল বলেও মনে হয় না। হঠাৎ একটা বাঁক ফিরেই দেখি সে নেই। সেখানে একটিমাত্র পথ অনেক দূর পর্য্যন্ত সোজা ভাবে চলে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি দৌড়োলেও আমি সেখানে পৌঁছবার আগে তার পক্ষে অন্য মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু তবু তাকে দেখতে পেলাম না।"

"যেখানে অদৃশ্য হয়েছিল, সেখানে আমায় নিয়ে যেতে পার, এক্ষুনি?" আমার কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক উত্তেজনার আভাস পেয়েই বোধহয় লাওচেন সবিস্ময়ে বল্লে,—"কিন্তু সেখানে এখন গিয়ে কি হবে! আমি তখনি আলো জ্বেলে খুব ভাল করে খুঁজে দেখেছি? আর এতক্ষণ সে কি সেখানে আমাদের জন্যে বসে আছে মনে করো।"

"তুমি নিয়ে যেতে পারো কিনা তাই বল না?"

"তা বোধ হয় পারি, কিন্তু কেন?"

"সব কথা বলবার এখন সময় নেই। তাড়াতাড়ি চলো।"

লাওচেন কি ভেবে আর কিছু আমায় জিজ্ঞাসা করলে না। আমায় পথ দেখিয়ে সামনের সুড়ঙ্গ দিয়ে এগিয়ে চলল।

সুড়ঙ্গের গোলক ধাঁধায় আমি হ'লে বোধহয় কিছুতেই পথ চিনে যেতে পারতাম না, কিন্তু লাওচেনের দেখলাম এবিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতা আছে। কোথাও সে একবার থামল না, দ্বিধা করলে না কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে। অনায়াসে গুটি দশেক মোড় ঘুরে, এক জায়গায় এসে বল্লে,—"এই খানে।"

জিজ্ঞাসা করলাম,—"ঠিক জানো এইখানে? পথ ভুল হয়নি ত তোমার?"

"না পথ ভুল হবে কেন! এ দুদিন ধরে অধিকাংশ সুড়ঙ্গই ঘুরে ঘুরে মুখস্ত হয়ে গেছে।"

"তার মানে! সুড়ঙ্গের পথে ঘুরে বেড়িয়েছ কেন? আর এ পথের সন্ধান পেলেই বা কেমন করে?"

লাওচেন একটু চুপ করে থেকে হেসে বল্লে,—"ঘুরে বেড়িয়েছি তোমার খোঁজে। আর সন্ধান পেয়েছি তুমি সে রাত্রে নিরুদ্দেশ হবার পর পাহাড়ের ভেতর আওয়াজ শুনে।"

সত্যিই ত! লাওচেনের এ সুড়ঙ্গ পথে দেখা দেওয়া যে বিস্ময়কর তা এতক্ষণ অন্য সব ব্যাপারের উত্তেজনায় মনে হয় নি।

আমার গুলির শব্দে যে পাহাড় ধ্বসে পড়েছিল তার শব্দ লাওচেনের তাঁবু পর্য্যন্ত পৌঁছেচে শুনে অবশ্য একটু অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু সে সব কথা আলোচনার অন্য সময় ঢের পাওয়া যাবে। আমি টর্চ্চটা পাথরের দেয়ালের চারিধারে ঘুরিয়ে ফেলতে ফেলতে হঠাৎ আনন্দে উত্তেজনায় কেঁপে উঠলাম। বল্লাম, "এইবার হয়ত তোমার ছোরা কাজে লাগতে পারে লাওচেন! প্রস্তুত থাক।"

"ছোরা কেন, আমার কাছে পিস্তল আছে, কিন্তু পাথরের দেয়ালে ছুঁড়ব নাকি!"

পাহাড়ের সেই ফাটলের কাছে সরে গিয়ে সেটায় একটু মৃদু চাপ দিয়ে বল্লাম—"না, পাথরের দেয়ালে নয়, মামাবাবুর গোপন আস্তানার সন্ধান জেনে যে সর্ব্বনাশ করতে এসেছে, তাকে পালাতে না দেবার জন্যে।"

লাওচেনের ট্যারা-চীনে চোখও এবার যেন কপালে উঠল।

"মামাবাবুর গোপন আস্তানা!"

ফাটলের ধারে জোরে চাপ দিতেই দরজার পাথরটা তখন ঘুরে গিয়ে একটা সুড়ঙ্গ পথ বেরিয়ে পড়েছে। টর্চ্চটা তাড়াতাড়ি নিভিয়ে ফেলে চুপি চুপি বল্লাম,—"হ্যাঁ, লি-সিন কেমন করে সন্ধান পেয়েছে জানিনা, কিন্তু এর ভেতরই সে যে অদৃশ্য হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবার তাকে এখানে ধরতে হবেই।"

সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে এবার আগুপিছু হয়ে আমরা দুজনে এগিয়ে

চললাম। অন্ধকারে কিছুই দেখা ·যায় না। তুধারে দেওয়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে আমি সামনের পথ ঠিক করছি, লাওচেন পেছন থেকে আমার কাঁধ ছুঁয়ে চলেছে। বেশীদূর এভাবে যেতে হ'ল না। খানিক এগিয়ে স্থড়ঙ্গ পথ একটি প্রকাণ্ড বিশাল গুহার মুখে শেষ হয়েছে। সেইখানে পৌছেই আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে লাওচেনের হাতে চাপ দিয়ে থামতে ইসারা করলাম। সামনের গুহাটি যেমন লম্বা চওড়া তেমনি উচু, সে গুহার একেবারে অপর প্রান্তে মিট মিট করে একটি আলো জ্বলছে। বিশাল গুহার অন্ধকার তাতে দূর হয় নি। কিন্তু সেই আলোই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। গুহার ভেতর আসবাবপত্র বিশেষ কিছু থাকলেও ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। আমাদেব দিকে পিছন ফিরে পাথরের মেঝেয় পাতা ঘাসপাতার একটি বিছানার ওপর বসে লি-সিন একান্ত মনোযোগ সহকারে একটা কিছু যে দেখছে তা আমরা কিন্তু বেশ ভাল করেই বুঝতে পারলাম।

এখানে তার অনুসরণ যে কেউ করতে পারেনা, এবিষয়ে লি-সিন বোধহয় বেশ নিশ্চিন্তই ছিল। সেই জন্যেই বোধহয় আমরা সন্তর্পণে তার হাত তিনেক কাছাকাছি না যাওয়া পর্য্যন্ত সে কিছু টের পায়নি। তারপর হঠাৎ আমাদের মৃত্ব পদশব্দেই বোধহয় চমকে সে ফিরে তাকাল। সেই মুহূর্ত্তে টর্চ্চটা জ্বেলে তার মুখে ফেলে আমি বল্লাম,—"খবরদার নড়ো না, তাহ'লেই মরবে।"

লি-সিনের তখনকার স্তম্ভিত মুখভঙ্গি দেখবার মত। আমাকে ও লাওচেনকে একসঙ্গে এভাবে দেখবার আশা সে নিশ্চয়ই করেনি। চীনাদের মুখোসের মত মুখে কোন ভাব ফোটেনা এ কথা যে মিথ্যা সেই দিনই তা বুঝেছিলাম। কিন্তু এ রকমভাবে হাতের মুঠোয় পেয়েও আর একটু হ'লে আমরা তাকে হারাতে বসেছিলাম। স্থাণুর মত কয়েক সেকেণ্ড বসে থেকে হঠাৎ আমাদের চমকে দিয়ে লি-সিন লাওচেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লাওচেন একেবারেই প্রস্তুত ছিল না এই আকস্মিক আক্রমণের জন্যে। তার পিস্তলের গুলি ছুটল—কিন্তু ছুটল উল্টো দিকে। এবং লি-সিনের ধাক্কায় পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলটাও ছিটকে পড়ল মেঝের উপর। সত্যি কথা বলতে কি প্রথমটা এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে আমি হতভম্বই হয়ে গেছলাম। লাওচেনকে চিৎ করে ফেলে আর একটু হলেই লি-সিন সুড়ঙ্গ দিয়ে বোধ হয় সরে পড়ত। ধরা পড়ল সেও নিজেরই দোষে। লাওচেনকে কাবু করে ফেলে সোজা ছুটে পালালে আমার বোধ হয় কিছু করবার ক্ষমতাই থাকত না। কিন্তু সে গুহার ভেতর থেকে ছোট একটা নোট বইএর মত খাতা তুলে নিতে গিয়েই নিজের বিপদ বাধালে। আমার বিমূঢ়তা তখন কেটে গেছে। পিস্তলটা যেখানে ঠিকরে পড়েছিল সেখান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে লি-সিন দৌড় দেবার আগেই আমি তার দিকে লক্ষ্যস্থির করে দাঁড়ালাম। বিছানা থেকে বইটা তুলে নিয়ে

উঠে দাঁড়ান আর লি-সিনের হ'ল না। আমার দিকে চেয়ে সে স্থির হয়ে বসে পড়ল। লাওচেন ততক্ষণে সামলে উঠে বসেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে পেছন থেকে গিয়ে লি-সিনকে জাপটে ধরলে। এবারে লি-সিনের আর কোন বেয়াড়াপনা করবার সাহস বোধহয় ছিল না। হাত থেকে বইটা কেড়ে নেবার সময় সে শুধু আমার দিকে চেয়ে অদ্ভুত ভাবে হেসে বল্লে,—"কাজটা ভালো করলেন না; আপনাকে এর জন্যে পস্তাতে হবে।"

"তার আগে তুমি এখন পস্তাও।" বলে আমি লাওচেনকে ভালো করে তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলতে বল্লাম।

লাওচেন অবশ্য শত্রুকে একেবারে শেষ করে দেবারই পক্ষপাতী। তার যে রকম জেদ দেখলাম তাতে মনে হ'ল পিস্তলটা আমার হাতে না থাকলে সে লি-সিনের গায়ে গোটা কয়েক গুলির ফুটো করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করত না। কিন্তু যত বড় শত্রুই হোক এ রকমভাবে জানোয়ারের মত তাকে গুলি করে মারা আমার পক্ষে অসম্ভব। বিছানার একটা কম্বলকে ছুরি দিয়ে কেটে দড়ি বানিয়ে লি-সিনকে আমরা পিছমোড়া করে বেঁধে গুহার একদিকে শুইয়ে দিলাম। তর্ক বাধল তারপর কি করা যায় তাই নিয়ে। গুহার ভেতরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে লাওচেন ও আমি ওই নোটবই ও সামান্য কয়েকটা রান্নাবান্নার সরঞ্জাম ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। নোট বইএর ভিতরও একটি কাগজে

সামান্য কয়েকটা দুর্বোধ অঙ্কের অক্ষর ছাড়া আর কিছু নেই। নোট বইটাতে যাই থাক সেটা যে অত্যন্ত মূল্যবান এবং লি-সিনের যে সেটা চুরি করাও সঙ্কল্প ছিল এবিষয়ে আমার মনে তখন কোন সন্দেহ নেই। সে চুরি যখন নিবারণ করা গেছে তখন মামাবাবুর মঙপোকে নিয়ে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমি ওই গুহাতেই অপেক্ষা করতে চাইছিলাম। কিন্তু লাওচেন কিছুতেই রাজী হ'ল না। তার মতে আমাদের গুহায় থাকা মানে অকারণে নিজেদের বিপন্ন করা। লি-সিন যে একাই এ গুহার সন্ধান জেনেছে তার ঠিক কি? তার দলের লোকেরা হয়ত একথা জানে এবং তার দেরী দেখে তার খোঁজেও আসতে পারে। তখন আমরা ধরা পড়বই। মামাবাবুর এ নোট বইএর মূল্য যখন তাদের কাছে এত বেশী, তখন এটা তাদের হাত থেকে রক্ষা করাও আমাদের কর্ত্তব্য, এই হ'ল তার যুক্তি।

বল্লাম—"কিন্তু মামাবাবুরাও ত এসে এদের কবলে পড়তে পারেন!"

লাওচেন একটু হাসল,—"না তা পড়বেন না!" তারপর একটু থেমে আবার বল্লে,—"মামাবাবুর ওপর এত অবিশ্বাস কেন! এদের হাত থেকে যিনি অমন ভাবে একবার পালাতে পেরছেন তিনি সহজে ধরা দেবার পাত্র নয়। আমাদের এখান থেকে নিজেদের তাঁবুতে গেলে কোন ক্ষতি হবে না কোন দিক দিয়ে। আমার সন্দেহ যদি অমূলক হয়, লি-সিনের দলের লোক যদি কেউ

নাও আসে, তাহলেও আমি এখানে যে চিঠি রেখে যাচ্ছি তা থেকেই মামাবাবু সব কথা জানতে পারবেন। আমাদের ঠিকানাও রেখে যাচ্ছি।"

লাওচেনের কথাতেই শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হ'ল। নোট বইএর একটি পাতা ছিঁড়ে সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে লিখে লাওচেন চর্ব্বির মিটমিটে বাতিটির কাছে পাথর চাপা দিয়ে চিঠিটি রেখে দিলে।

কিন্তু তবু সুড়ঙ্গের গুপ্ত দ্বার ঠেলে বেরিয়ে যাবার সময় মনটা কেমন যেনখুঁত খুঁত করতে লাগল। লি-সিন আমাদের চলে আসবার সময় কোন কথাই বলেনি। মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে লাওচেন তার সে পথ বন্ধই করে দিয়ে ছিল, তবু তার শেষ মুহূর্ত্তের দৃষ্টি ভোলবার নয়। তার ভেতর দুর্বোধ কি ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত যেন আছে। মামাবাবুর বুদ্ধিতে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে, কিন্তু তিনিও এখানে অসন্দিগ্ধভাবে আসছেন। সতর্ক হবার আগেই যদি আবার তিনি এদের কবলে পড়ে যান!

লাওচেনের সঙ্গে যেতে যেতে নিজের মনের উদ্বেগ আমি বেশীক্ষণ চেপে রাখতে পারলাম না। বল্লাম—"আমাদের এভাবে চলে আসা ঠিক হ'ল না কিন্তু। মামাবাবু যদি সত্যি আবার কোন বিপদে পড়েন।"

লাওচেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আমার কাঁধে হাত রেখে অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বল্লে,—"শুনুন মিঃ রায়,

বিপদ যদি আজ কারুর ঘনিয়ে থাকে সে মায়াবাহুড়দের সর্দ্দারের !”

“মায়াবাহুড়দের সর্দ্দার !”

“হ্যাঁ আজই তার দেখা পাবেন। আজ রাত্রেই তার লীলা শেষ।”

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—“কি তুমি বলছ লাওচেন ? হঠাৎ এমন সবজান্তা হ'লে কি করে ?”

লাওচেন তেমনি গম্ভীর ভাবে বল্লে—“একটা অনুরোধ করছি, মিঃ রায় কোন প্রশ্ন এখন আর করবেন না। মায়াবাহুড়-দের রহস্য-ভেদ করবার যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে আমার কথা আপনাকে আজ বিনা প্রতিবাদে শুনতে হবে।”

তখনকার মত কোন কথাই আর বল্লাম না, কিন্তু প্রশ্ন না করার প্রতিজ্ঞা শেষ পর্য্যন্ত রাখা গেল না, যদিও সে প্রশ্নের বিষয় আলাদা।

লাওচেনের সোজা পথ জানা ছিল বলেই পাহাড়ের ভেতর-কার সুড়ঙ্গগুলি ক্লান্ত অবস্থাতেও এবার তেমন দীর্ঘ বোধ হয় নি। পাহাড় থেকে বেরিয়ে লাওচেনের তাঁবুর দরজার কাছে পৌঁছে কিন্তু আমায় থমকে দাঁড়াতে হ'ল। আমরা ঢোকবার আগে তাঁবুর ভেতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে লাওচেনকে অভি-বাদন করে চলে যাচ্ছিল ! সম্ভবতঃ তাঁবুর পাহারাতেই তাকে রাখা হয়েছিল। তাঁবুর দরজার কাপড় সরাবার সঙ্গে ভেতরকার

আলোয় মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে তার মুখ দেখতে পেলেও তাকে চিনতে আমার দেরী হয়নি। আমার সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়বার কারণও তাই।

লাওচেন আমার হাত ধরে টান দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"আবার দাঁড়ালেন কেন? চলুন ভেতরে।"

"যাচ্ছি, কিন্তু একটা কথা তার আগে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে আমি বাধ্য হচ্ছি।"

লাওচেন হেসে বল্লে—"না আপনাকে নিয়ে পারা গেল না। করুন জিজ্ঞাসা, কিন্তু মায়াবাদুড় সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে জানবেন আমি বোবা।"

"না মায়াবাদুড় সম্বন্ধে নয়, যে লোকটি এইমাত্র বার হয়ে গেল তার সম্বন্ধে। একে কোথায় পেলেন?"

লাওচেন আমার দিকে চেয়ে আবার হেসে বল্লে,—"যাক্ লোকটা তাহলে মিথ্যা বলেনি। আপনি তাহালে চিনতে পেরেছেন?"

"না চেনবার কি আছে, লোকটা আমাদের অশ্বতর-চালকদের একজন ছিল।"

"তবে ওর ত কোন অপরাধ হয়নি ও আমার কাছে নিজেই তা বলেছে।"

একটু অধৈর্য্যভাবে বল্লাম—"অপরাধ আছে লাওচেন। লোকটা আমাদের দল থেকে রহস্যজনক ভাবে একদিন সরে পড়ে, তারপর ও এখানে উদয় হ'ল কি করে!"

কথা কইতে কইতে আমরা এবার তাঁবুর ভেতর এসে ঢুকে-ছিলাম। লাওচেন একটা চেয়ারে বসে পড়তে গিয়ে, হঠাৎ চমকে আমার দিকে ফিরে বলে,—"সে কি! রোগে পড়ার দরুণ আপনারা ওকে কাচিনদের এক গ্রামে রেখে আসেন নি?"

আমি একটু হাসলাম মাত্র। লাওচেন যেন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠে বল্লে,—"আপনাদের বিশ্বাসী লোক ভেবেই একদিনের পরিচয়ে আমি যে ওকে তাঁবুর পাহারায় পর্য্যন্ত রেখেছিলাম। কাল সবে ও এখানে কাজ নিয়েছে; আমায় জানিয়েছে যে, রোগ সারবার পর ও নিজে আপনাদের খোঁজে এতদূর এসেছে।"

"আমাদের খোঁজেই এসেছে ঠিক, কিন্তু প্রভুভক্তিতে নয়। মায়াবাদুড়দের সর্দ্দার ধরবার যোগাড় করছেন, অথচ তাদের অনুচরদের চেনেন না মিঃ লাওচেন।"

লাওচেন খানিকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কি ভেবে বল্লে— "আপনি বিশ্রাম করুন মিঃ রায়, আমি আসছি।"

বাধা দিয়ে আমি বল্লাম,—"আপনি মিছি মিছি যাচ্ছেন তার দেখা পাওয়ার আশা অল্প! আমাকেও সে দেখেছে।"

"তবু একবার যাওয়া দরকার।" বলে লাওচেন বেরিয়ে গেল এবং বহুক্ষণ বাদে যখন ফিরে এল তখন আমি দীর্ঘ উপবাস ভঙ্গ করে শ্রান্ত হয়ে একটু বিছানায় গা এলিয়েছি।

আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার দরকার হ'ল না।

উদ্বিগ্নমুখে চেয়ারে বসে পড়ে লাওচেন বল্লে,—"আপনার কথাই ঠিক। তার কোন পাত্তাই নেই।"

একটু বিদ্রূপের স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম,—"মায়াবাদুড়দের সর্দ্দারের দেখা কি তবুও আজ পাওয়া যাবে মনে হয়!"

লাওচেন এবারে অদ্ভুতভাবে হেসে বল্লে,—"সে বিষয়ে আরও নিঃসংশয় হ'লাম।"

তার গলার স্বরে আমার ব্যঙ্গ করবার প্রবৃত্তি কিন্তু কেমন করে উড়ে গেল। সে স্বর শুধু দৃঢ় নয় কেমন যেন হিংস্র।

বিছানায় উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলাম,—"আমায় কি করতে হবে?"

লাওচেন একটু হেসে বল্লে,—"বিশেষ কিছু নয়, এই ঘরে প্রথম যে প্রবেশ করবে তাকে গুলি করতে হবে।"

লাওচেনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের আলো নিভে গেল। লাওচেনের পদশব্দও পেলাম। তাঁবুর দরজা সরিয়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিছু বলবার আগেই বাইরে থেকে তার গলা শুনতে পেলাম।

"আমি বাইরে আছি। ঘর থেকে নড়বেন না।"

লাওচেন ত বেশ অনায়াসে বলে গেল, "ঘর থেকে নড়বেন না" কিন্তু সেই অন্ধকার ঘরে প্রতি মুহূর্ত্তে কাণ খাড়া করে পরম শত্রুর পায়ের শব্দের জন্যে অপেক্ষা করা যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। লাওচেনের অনুমান

সত্য হ'লে মায়াবাহুড়দের সর্দ্দার যে কোন মুহূর্ত্তে এসে হাজির হ'তে পারে। কিন্তু নিতান্ত সাধারণ মানুষ ত সে নয়। অসীম তার ধূর্ত্ততা, অদ্ভুত, এবং এক হিসাবে অলৌকিক তার ক্ষমতা। চোখ কাণ বুঁজে ভালো মানুষটির মত সোজাসোজি ঘরে ঢুকে আমার গুলিটি বুক পেতে সে নিশ্চয়ই নেবে না। কি ভয়ানক অভিসন্ধি নিয়ে, কি রকম অপ্রত্যাশিতভাবে সে এসে উপস্থিত হবে কে জানে। পিস্তলের গুলি যদি ছোটে—তাহলেও কার যে আগে ছুটবে, তা বলা কঠিন। লাওচেন বাইরে লুকিয়ে পাহারায় আছে জেনেও, কোন সাহস, সত্যি কথা বলতে গেলে পেলাম না। মায়াবাহুড়দের হাতে লাওচেন ত কম নাকাল এ পর্য্যন্ত হয় নি, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে বাঁচাতে পারলে ত' আমায় সাহায্য করবে! গাঢ় অন্ধকারে পিস্তলটা সজোরে মুঠোতে চেপে তাঁবুর দরজার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে থাক্‌তে থাক্‌তে টের পাচ্ছিলাম আমি বেশ ঘেমে উঠেছি। এ রকম ভাবে ঘরের ভেতর অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় থাকার দরুণই বোধহয় অস্বস্তি ও যন্ত্রণা এত বেশী হচ্ছিল। তাঁবুর বাইরে খোলা জায়গায় শত্রুর সম্মুখীন হ'তে হ'লে আমার মনের জোর এতটা বোধহয় কমে যেত না।

লাওচেন ঘরে কেউ ঢোকবামাত্র গুলি করতে বলেছে। তার এ কথা থেকে এটুকু বোঝা কঠিন নয়, যে গুলি করার তৎপরতার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে,—আমার জীবন পর্য্যন্ত। এক

মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'লে বা লক্ষ্য ঠিক না হ'লে আফশোষ করবার জন্যও বোধ হয় আর বেঁচে থাকতে হবে না। জন্তু-জানোয়ার ছাড়া মানুষের ওপর কখন পিস্তল ব্যবহার এর আগে করি নি। কিন্তু এখন সে বিষয়ে কি উচিত অনুচিত তা ভাবছিলাম না। শুধু ভয় হচ্ছিল ঠিক সময়ে হাত ও মনের জোর বুঝি থাকবে না। যে রকম উত্তেজনার মধ্যে প্রত্যেক মুহূর্ত্ত কাটছিল, তাতে খানিকক্ষণ বাদে মনের অবসাদ আসা খুব স্বাভাবিক। সামান্য একটু শব্দতেই থেকে থেকে চমকে উঠছিলাম, তাঁবুর ভেতরকার অন্ধকারে চোখের ওপর যেন অদ্ভুত সব ছায়ামূর্ত্তি ভেসে যাচ্ছিল। শেষ পর্য্যন্ত মনে হচ্ছিল, কোনটা মনের ভুল আর কোনটা সত্য, তাই ঠিক করতে পারব না।

সময় এমনি করে বড় কম কেটে গেল না। এক একবার মনে হচ্ছিল লাওচেনের কথায় অতখানি বিশ্বাস করবার হয়ত কোন হেতু নেই। তার ধারণা হয়ত সম্পূর্ণ ভুল। মিছিমিছিই এমনি ভাবে অপেক্ষা করায় যন্ত্রণা ভোগ করছি। কিন্তু সে কথা ভেবেও নিশ্চিন্ত হয়ে একাগ্র পাহারা শিথিল করতে পারলাম কই!

একবার মনে হ'ল লাওচেনের কথা অমান্য করে তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়! বিছানা থেকে উঠে পর্দ্দার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। চারিধার নিস্তব্ধ, বাইরে শীতের যে কনকনে হাওয়া এখানে রোজ রাত্রে সজোরে বয় তাও

শান্ত হয়ে এসেছে। পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে বাইরে তাকালাম, কিন্তু সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে কি আর দেখতে পাব! বাইরে কাণ পেতে কোনো শব্দ শোনা যায় কি না বোঝবার বৃথাই চেষ্টা করলাম। সমস্ত পাহাড় অরণ্যও যেন নিশ্বাস রোধ করে কি একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রতীক্ষা করছে। এতটুকু আওয়াজ কোথাও নেই।

লাওচেনের কথা ঠেলে তাঁবু থেকে বেরুতে শেষ পর্য্যন্ত পারলাম না। যাই ঘটুক না কেন, আমায় আজ এ তাঁবুর ভেতর থেকে পাহারা দিতেই হবে। মনকে সেই জন্যেই প্রস্তুত করা দরকার! যা হবার তা যেন তাড়াতাড়ি হয়ে গেলেই এখন অবশ্য ভাল হয় মনে হচ্ছিল, অধীর ভাবে এই অপেক্ষা করে থাকার উদ্বেগ ও উত্তেজনা আর সহ্য করা যাচ্ছে না!

আমার মনের অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্যেই যেন ঠিক সেই মূহূর্ত্তে তাঁবুর পেছন দিকে অকস্মাৎ অদ্ভূত একটা শব্দ শোনা গেল। ধারাল ছুরিতে তাঁবুর কাপড় অনেকখানি একটানে কে যেন কেটে ফেলেছে। গভীর নিস্তব্ধতার ভেতর অতর্কিতে এই শব্দ শুনে সমস্ত গায়ে আপনা থেকেই যে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল এ কথা অস্বীকার করব না, কিন্তু হতবুদ্ধি সত্যই হয়ে পড়িনি। মামাবাবুকে অজ্ঞান অবস্থায় যে দিন সরিয়ে নিয়ে যায়, সেদিনও তাঁবুর কাপড় এই রকম ভাবে যে কাটা ছিল তা তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হয়েছে। শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই সেদিকে ফিরে আওয়াজ ধরেই লক্ষ্য ঠিক করে গুলি ছুড়লাম একটি—দুটি।

কোন প্রত্যুত্তর, কোন সাড়াশব্দ তারপর আর নেই। টর্চটা বিছানার ওপরই ছিল! সেটা খুঁজে নিয়ে জ্বালতে যাচ্ছি, হঠাৎ পিঠের ওপর একটা শক্ত জিনিষের খোঁচা অনুভব করলাম! খোঁচাটা যে কিসের তা বুঝতে বিলম্ব হবার কথা নয়। মেরুদণ্ডের ঠিক বাঁ দিকে পিস্তলের নল যে ঠেলে ধরেছে, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করারও তার নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য নেই। তাঁবুর পিছনের দিকে যখন আমি কাপড় চেরার শব্দ লক্ষ্য করে গুলি করছি তখনই সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে শত্রু কি ভাবে আমায় বোকা বানিয়েছে তা নিয়ে মাথা ঘামান তখন বৃথা, তার সময়ও ছিল না।

পিঠে পিস্তলের খোঁচা যে দিয়েছিল এবারে তার কথা শোনা গেল।

কিন্তু সে কথা আমার কাছে অর্থহীন। সেটা যে চীনা ভাষা তা বুঝলেও, তার ভেতর এক, 'লাওচেন' এই সম্বোধন ছাড়া আর কিছুই আমার বোধগম্য নয়। কথা না বুঝলেও, লাওচেনের প্রতি বিশেষ প্রীতি যে মায়াহাতুড়দের সর্দ্দারের নেই তা তার বলার ধরণ থেকেই স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম। আমি যে লাওচেন নই, একথা জানতে পারলেও হয়ত তার আক্রোশ দূর হবে না, তবু আমার মত সেও যে একটু ঠকেছে তা জানাবার লোভ ত্যাগ করতে পারলুম না। তার কথা শেষ হবা মাত্র বল্লাম,—"তোমার পিস্তলের নল বসাতে একটু ভুল হয়েছে; এটা লাওচেনের পিঠ নয়।"

ইংরাজিতে কথাগুলো বলার দরুণ, সন্দেহ ছিল, সে তা বুঝবে কিনা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমার বক্তব্য শেষ না হতেই হঠাৎ আমার পিঠ থেকে পিস্তলের নল সরে গেল। কিন্তু নল সরে যাবার দরুণ নয়, সেই মূহূর্ত্তে রহস্যময় মায়াবাদুড়দের সর্দ্দারের মুখ থেকে অতর্কিতে যে বিস্ময়ের ধ্বনি বেরিয়ে পড়ল তাতেই চমকে পেছনে ফিরে টর্চ্চটা জ্বেলে ফেল্লাম।

একি মামাবাবু!

মামাবাবু মুখের ওপরকার পর্দ্দাটা সরিয়ে ফেলে গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "হুঁ, আমি এ রকমটা আশা করিনি। লাওচেন কোথায় গেল?"

"লাওচেন আপনার পেছনেই আছে মিঃ সেন। আপনার পিস্তলটা শুধু দয়া করে টেবিলের উপর রাখুন।"

ঘরের আলোটা ইতিমধ্যে জ্বেলে দিয়ে লাওচেন মামাবাবুর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত অর্থহীন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মত। বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের ধাক্কায় আমি তখন সত্যই হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। প্রথমে মায়াবাদুড়দের সর্দ্দারের জায়গায় মামাবাবু, তারপর মামাবাবুর বিরুদ্ধে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে লাওচেন,—যে কোন সুস্থ মাথাকে ঘুলিয়ে দেবার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু তখনও অনেক কিছু দেখতে আমার বাকী আছে।

মামাবাবু আমারই মত ঘটনার এই পরিণতির জন্যে প্রস্তুত

বোধ হয় ছিলেন না, কিন্তু মুখে তাঁর কোন রকম ভাবান্তর দেখা গেল না। পিস্তলটা লাওচেনের কথা মত টেবিলের ওপর রেখে তিনি ঈষৎ হেসে বল্লেন,—"তুমি আজ তাহলে জিতেছ মনে হচ্ছে, লাওচেন ?"

লাওচেন এগিয়ে এসে আমার শিথিল হাত থেকেও পিস্তলটা টেনে নিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর কাছেই একটা চেয়ারে বসে পড়ে বল্লে,—"আপনার প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ মিঃ সেন ; আমার কাজ যে অনেক সহজ করে দিয়েছেন তার জন্যেও বোধ হয় কৃতজ্ঞতা জানান উচিত। আপনার নোট-বুকটি পেয়ে আমার অনেক পরিশ্রম, অনেক হাঙ্গামা বেঁচেছে।"

লাওচেনের স্বরের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গতেও মামাবাবুকে কিন্তু বিচলিত হতে দেখলাম না। হেসে বল্লেন,—"হ্যাঁ নোটবুকটা খুব দামী আমার কাছে।"

"দামী বলেই ত আপনাকে এর জন্যে ফাঁদে ফেলতে পারব জানতাম।" বলে লাওচেন হেসে উঠল। আসল রহস্য না বুঝলেও লাওচেনের স্বরূপ এতক্ষণে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল টুঁটি চেপে ধরে তার ওই কুৎসিত হাসি বন্ধ করে দিই। কিন্তু আমরা নিরুপায়। লাওচেনের পিস্তল আমাদের দিকে হিংস্রভাবে মুখ উঁচিয়ে আছে।

মামাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—"এখন তাহলে তুমি কি করতে চাও ?"

"বিশেষ কিছু না। নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাদের কাছ থেকে এবার শুধু বিদায় নিতে হবে। য়ুনানে আমার জন্যে সত্যিই অনেকে অপেক্ষা করে আছে।"

"তারা বৃথাই অপেক্ষা করে আছে লাওচেন। নোটবুক নিয়ে সেখানে তুমি পৌঁছোতে পারবে না।"—মামাবাবুর মোলায়েম কণ্ঠস্বর যে কারণে হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে তখন বজ্র-গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা টের পেয়ে কোনমতে আমি তখন উত্তেজনা দমন করে আছি।

লাওচেনও সে স্বরে চমকে উঠেছিল, কিন্তু নিজেকে সংবরণ করে সে হেসে বল্লে,—"এখনও রসিকতা করবার মত মনের অবস্থা আপনার আছে দেখে খুশী হচ্ছি মিঃ সেন।"

"মাথার কাছে পিস্তলের নল আমি ঠিক রসিকতা বলে মনে করি না লাওচেন। লি-সিন, নলটা না হয় মাথায় ঠেকিয়েই দাও।"

আমাকে বিস্ময়-বিমূঢ় করে সত্যিই লি-সন খানিক আগে তাঁবুর কাটা পরদা দিয়ে নিঃশব্দে ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে একটু এগিয়ে এল।

লাওচেনের মুখ তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। মামাবাবু তাকে বল্লেন,—"তুমি গুলি করে বড় জোর একজনকে জখম করতে পার, কিন্তু তাহলেও এ নোটবুক য়ূনানে পৌঁছোবে না তুমি জান।"

নিঃশব্দে খানিক বসে থেকে লাওচেন নিজের পিস্তলটা এবার ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর অদ্ভুত ভাবে একটু হেসে বল্লে,—"এইটুকু আমার ভুল হয়েছিল বুঝতে। আমি দুই শত্রুকে আলাদা আলাদা করে দেখেছিলাম।"

"হ্যাঁ, মায়াবাদুড়দের সঙ্গে নিরীহ কীটতত্ত্ববিদের সংযোগ হতে পারে তা তুমি ভাবতে পারনি, কিন্তু ওই সামান্য ভুলের জন্যেই সর্ব্বনাশ হয়। নোটবইটা এবার তাহলে দিতে পার।"

লাওচেন অমন সুবোধ বালকের মত সেটা যে বার করে মামাবাবুর হাতে তুলে দেবে তা ভাবিনি। তার মুখের ভাব দেখেও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলাম।

মামাবাবু নোটবুকটা খুলে ভাল করে দেখে-শুনে সন্তুষ্ট চিত্তেই পকেটে রাখতে যাচ্ছেন, এমন সময় লাওচেন আর একবার হেসে উঠে বল্লে,—"শেষ পর্য্যন্ত আমারই কিন্তু জিৎ হ'ল মিঃ সেন!"

এবার মামাবাবুই বিদ্রূপ করে বল্লেন,—"আমার বুদ্ধিটা খুব সূক্ষ্ম নয়, একটু বুঝিয়েই বল।"

"বোঝবার বিশেষ কিছু নেই, ও নোটবই বৃথাই বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন!"

"তার মানে?"

"মানে—এ বই আমার হাত থেকে খোয়া যাবার অপেক্ষায় আমি চুপ করে বসে ছিলাম না। ঘণ্টা তিনেক আগে আমার

লোক এ বইএর আসল তথ্যটুকু নিয়ে য়ুনান রওনা হয়ে গেছে। আপনার ভাগনে মিঃ রায় তাকে চেনেন। আপনি মিচিনা পৌঁছোবার আগেই য়ুনান সরকারের কাছে আপনার দেওয়া ল্যাটিচিউড, লঙ্গিচিউডের হিসাব পৌঁছে যাবে। য়ুনানের সীমান্ত নির্দ্দেশ এখনই চলেছে। সামান্য একটু সীমান্তরেখার অদলবদল করার ব্যবস্থাও অনায়াসে হয়ে যাবে ততদিনে…”

মামাবাবুর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে একটু থেমে নিষ্ঠুর ভাবে হেসে লাওচেন তার কথা শেষ করলে,—“কে জানবে বলুন সেই সামান্য অদল বদলের ফলে একটা গোটা রেডিয়মের খনি বর্ম্মার হাত থেকে চলে যাচ্ছে।”

লাওচেনের কুৎসিত হাসি থেমে যাবার পর সমস্ত তাঁবু খানিকক্ষণের জন্যে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মামাবাবু ও লি-সিনের মুখ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমার কাছে সমস্তই একেবারে দুর্ব্বোধ। এইমাত্র যে সব ঘটনা চোখের ওপর দ্রুত ঘটে গেল, যে সমস্ত অদ্ভুত খবর শুনলাম সে গুলির পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধই আমি নির্ণয় করতে পারিনি। নোটবুক নিয়ে কাড়াকাড়ি, ল্যাটিচিউড, লঙ্গিচিউড, য়ুনানের সীমান্ত, শেষ পর্যন্ত রেডিয়াম—এ সব যেন লাওচেনের অসম্বন্ধ প্রলাপ, আমাদের অভিযানের সঙ্গে এই সমস্ত অবান্তর কথার কি সম্পর্ক আমি কিছুতেই ভাল করে গুছিয়ে বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

শুধু মামাবাবুর গম্ভীর মুখের কঠিন রেখাগুলি দেখে মনে হচ্ছিল এর ভেতর সত্যকার গভীর রহস্য সম্ভবতঃ আছে।

লাওচেন আবার একটু হেসে বল্লে,—"এখন মনে হচ্ছে নাকি যে সত্যিসত্যি কীট-তত্ত্বের সন্ধানে বেরুলেই ভাল করতেন? তবু কিছু কাজ হ'ত।"

মামাবাবু গম্ভীর মুখেই বল্লেন,—"তুমি ভুল করছ লাওচেন, আমরা সত্যি পোকার সন্ধানেই বেরিয়েছিলাম। সে সন্ধান অন্য পথে গেছে শুধু তোমারই জন্যে!"

"আমার জন্যে?"

মামাবাবু একটু হাসলেন,—"আমাদের কম্পাস্, জরিপের যন্ত্রপাতি এমন অদ্ভুত ভাবে চুরি না গেলে আমার চোখ খুলে যেত না। তুমি নির্বিঘ্নে তোমার কার্য্য সিদ্ধি করতে পারতে। আমরা কোন কিছু না জেনে পোকামাকড় নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম।"

লাওচেন বিদ্রূপের স্বরেই বল্লে,—"তাই নাকি! আলেয়া-দারুদের দেশ খোঁজবার কোন উদ্দেশ্য আপনার ছিল না বোধ হয়?"

"বিশ্বাস তুমি না করতে পার কিন্তু কম্পাস্ প্রভৃতি চুরি যাবার পরও আমি আলেয়া-দারুদের কথা জানতাম না।"

লাওচেন হাসল,—"যাক শেষ পর্য্যন্ত জেনে আমাদের উপকারই করেছেন। আপনার যন্ত্রপাতি চুরি যেই করুক, এখন মনে হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ করেনি। ভাগ্যিস্ আপনার কাছে

বাড়তি সরঞ্জাম ছিল, নইলে ল্যাটিচিউড লঙ্গিচিউড এত সহজে পাওয়া যেত না।"

"আবার একটু ভুল করলে লাওচেন, বাড়তি যন্ত্রপাতি আমার ছিল না।"

"তার মানে!" লাওচেন সন্দিগ্ধভাবে মামাবাবুর দিকে তাকালে।

মামাবাবু হেসে বল্লেন,—"না, তোমার সে সন্দেহের কারণ নেই। তোমায় মিথ্যে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছি না। বাড়তি যন্ত্রপাতি আমার দরকারই হয়নি।"

"তাহলে?"

"আমার যন্ত্র, সূর্য্য আর তারা আর এই জিনিষটি"—মামাবাবু পকেট থেকে 'ক্রোনোমিটার' ঘড়িটা টেবিলের ওপর রেখে আবার বল্লেন, "ক্ষমতা ও বুদ্ধি থাকলে এই দিয়েই কাজ চলে যায় জানলে অত হ্যাঙ্গাম তুমি বোধ হয় করতে না।"

লাওচেন খানিকটা চুপ করে থেকে বল্লে,—"তাই দেখছি। যাই হোক হ্যাঙ্গাম যে শেষ পর্য্যন্ত সার্থক হয়েছে, আপনার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে সেজন্য ধন্যবাদ।"

"ধন্যবাদটা আর একটু পরে দিও লাওচেন। এখনো কিছুই বলা যায় না। মিচিনা দূর হতে পারে কিন্তু হার্টজ্ কেল্লা ততটা বোধ হয় নয়। সেখানে সম্প্রতি একটা সামরিক বেতার ঘাঁটিও তৈরী হয়েছে বলে শুনেছি। আমরা আজই রওনা হচ্ছি, এই মুহূর্ত্তে।"

লাওচেন হেসে উঠল,—"এই মুহূর্ত্তে রওনা হয়ে দিনরাত সমানে পা চালিয়েও সাতদিনের আগে হার্টজ কেল্লাতে পৌঁছোতে পারবেন না। এখান থেকে য়ুনানের রাজধানী 'য়ুনানে'র পথ মাত্র তিনদিনের। আমার দূতকে সাহায্য করবার জন্যে পথে লোকজনও আগে থাকতে মজুত আছে।"

"তবু একেবারে চেষ্টা না করে হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত কি? তা ছাড়া তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌঁছে দিতে ত হবে!"

"আমাকে! কেন?"

"তোমার পায়ের মাপ সাধারণের চেয়ে একটু বড় বলে।"

আমি বিমূঢ় ভাবে মামাবাবুর দিকে তাকালাম। এ আবার কি রকম রসিকতা! লাওচেনের পা যে একটু বড় মাপের তা আমরা সবাই অবশ্য আগেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সে কথা এখানে কি সূত্রে আসে!

লাওচেন ঠোঁট বেঁকিয়ে বল্লে,—"আপনার কথারই প্রতিধ্বনি করে বলছি, আমার বুদ্ধিটা অত সূক্ষ্ম নয়, একটু বুঝিয়ে বলুন।"

"বলবার দরকার নেই, চাক্ষুষই দেখাচ্ছি।" বলে মামাবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তাঁবুর যে ধারে লাওচেনের বিছানা ছিল সে দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে লাওচেনের বড় চামড়ার ব্যাগটা খুলে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গেই লাওচেন চীৎকার করে উঠল, —"ব্যাগে হাত দেবেন না মিঃ সেন!"

মামাবাবু গম্ভীর ভাবে তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে বল্লেন,—

"আমার অনধিকার-চর্চ্চা মার্জ্জনা কোরো। তোমার সাজ সরঞ্জাম সম্বন্ধে আমার অনেক দিনের কৌতূহল আজ একটু মেটাব। ...এই যে পেয়েছি বোধ হয়।"

মামাবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই তাঁবুর মধ্যে অপ্রত্যাশিত এক কাণ্ড ঘটে গেল। মামাবাবু কি করছেন জানবার আগ্রহে আমি ও লি-সিন একটু বুঝি অসাবধান হয়ে পড়েছিলাম। সেই সুযোগেই হঠাৎ এক লাফ্ দিয়ে টেবিলের ওপরকার বাতিটা হাত দিয়ে উল্টে ফেলে লাওচেন ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও লি-সিন দুতিন সেকেণ্ডের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে তার পেছু নিয়েছিল। আমরা টেবিলের তলা থেকে বাতিটা জ্বালবার আগেই বাইরে দুবার পিস্তলের আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম।

বাতি জ্বালা হবার পর আমিও বেরুতে যাচ্ছিলাম। মামাবাবু বাধা দিয়ে বল্লেন—"দরকার নেই। লি-সিন একাই যথেষ্ট, তাছাড়া বাইরে মঙ্পো আছে!"

"কিন্তু এরকম হঠাৎ পালাবার কারণ কি?"

মামাবাবু কাগজের মোড়া খুলে অদ্ভুত আকারের জুতোর মত দুটি জিনিষ টেবিলের ওপর রেখে বল্লেন,—"হঠাৎ মোটেই নয়। পালাবার কারণ যথেষ্ট আছে। তার মধ্যে একটি এই।"

অদ্ভুত জুতো দুটো হাতে তুলে নিয়ে আমারও আর বুঝতে

কিছু বাকি রইল না। সাধারণ জুতো সে নয়। তার তলা ঠিক বাঘের থাবার মত তৈরী। মাটির ওপর চাপ দিলে ঠিক বাঘের পায়ের দাগই পড়ে।

মামাবাবু বল্লেন—"এই জুতোই তার বিরুদ্ধে খুনের প্রধান প্রমাণ। এই জুতো পায়ে দিয়েই সে আমাদের তাঁবুতে হানা দিয়েছে, পথের মাঝে আমাদের অনুচরকে খুন করেছে। লাও-চেনের পায়ের মাপ অসাধারণ না হলে এ জুতো পেয়েও, তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ প্রমাণ করতে আমাদের বেগ পেতে হ'ত।"

কিন্তু এ প্রমাণ আমাদের প্রয়োগ করবার সুবিধা বুঝি আর হ'ল না। খানিক বাদে লি-সিন ও মঙপো দুজনেই হতাশভাবে ফিরে এসে জানালে অন্ধকারে লাওচেন তাদের এড়িয়ে পাহাড়ের সেইসুড়ঙ্গ পথেই ঢুকে পড়েছে। সেখানকার গোলকধাঁধায় তার সন্ধান তারা পায় নি। মঙপো ও লি-সিন দুজনেই দূর থেকে গুলি ছুড়েছিল, কিন্তু লাওচেন তাতে আহত হয়েছে বলে মনে হয় না।

তাঁবুর সমস্ত লোকজন নিয়ে সুড়ঙ্গ পথে আর একবার সন্ধান করা হয়ত চলত, কিন্তু তাতেও ফল পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। লি-নিনের এ প্রস্তাবের তাই প্রতিবাদ করে আমি বল্লাম,—"আমাদের যত তড়াতাড়ি সম্ভব হার্টজ কেল্লায় যাওয়াই বেশী জরুরী নয় কি!"

মামাবাবু হেসে বল্লেন—"তা সত্যি লি-সিন। মায়াবাহুড়-দের চোখ সব দেখতে পায়, তার ডানা কোন বাধা মানে না। হুবার ফস্কালেও তিনবারের বার প্রতিশোধ নেবার সময় পরেও হবে। কিন্তু য়ূনানের সীমান্তের ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি কিনারা না করলে আর সুযোগ মিলবে না। আমাদের এখুনি রওনা হতে হবে।"

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"হুবার ফসকাবার মানেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। মায়াবাহুড় কার ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়!"

মামাবাবু হেসে বল্‌লেন—"কার ওপর আবার! তাদের বিশ্বাসঘাতক ভূতপূর্ব্ব সর্দ্দার লাওচেনের ওপর।"

"তাহলে সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে আমাদের শাসিয়ে চিঠি দেবার মানে কি! আপনাকেও জখম করে ধরে নিয়ে যাবার কি উদ্দেশ্য!

মামাবাবু আবার হেসে উঠলেন—"সে রাত্রে মায়াবাহুড় আমাদের শাসিয়ে চিঠি দেয় নি, শাসিয়েছিল লাওচেনকে!"

"লাওচেনকে! আপনি কি করে জানলেন?"

মামাবাবুর চোখে কৌতুকের দৃষ্টি দেখেই আমার মনে পড়ে গেল, খানিক আগে তাঁর মুখে বিশুদ্ধ চীনে ভাষা আমি শুনেছি।

আমার বিমূঢ় মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে মামাবাবু বল্লেন, "চীনেভাষা যে আমি জানি তা তখন ইচ্ছে করেই প্রকাশ করিনি, লাওচেন কি বলে দেখবার জন্যে! সে নিজের সুবিধামত সে

চিঠির ভুল ব্যাখ্যা আমাদের শুনিয়েছিল। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই সে সেদিন আমাদের তাঁবুতে রাত কাটিয়েছে, আমাদের পাহারা দেবার জন্যে নয়।”

“কিন্তু আপনাকে জখম করে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া!”

“আমায় জখম লাওচেনই করে তার পিস্তলের বাঁট মাথায় মেরে। যে গুলির শব্দ তুমি শুনেছিলে, তাও লাওচেনের পিস্তলের। আমি সাবধান হবার আগেই আমার পেছনে আত্ম-রক্ষা করে সে প্রথম লি-সিনকে গুলি করে। লাওচেনের তাঁবুতে আগুন ধরার পরও তাকে বেরুতে না দেখে লি-সিন সন্দিগ্ধ হয়ে আমাদের তাঁবুর দিকে আসছিল। লাওচেনের হঠাৎ আক্রমণের জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। আমি সামনে পড়াতেই লি-সিন আর কিছু করতে পারে নি। নিজে সাঙ্ঘাতিক আহত হয়ে সে ফিরে যায়। আমি কিছু করবার আগেই লাওচেন আমাকেও আঘাত করে।”

“কিন্তু লি-সিনের রক্তের দাগ খানিক দূর গিয়েই অমন আশ্চর্য্যভাবে মিলিয়ে গেল কি করে! আপনাকে ও মঙ্-পোকেই বা অমন উধাও করে কে নিয়ে গেল?”

“ব্যস্ত হোয়ো না, এক এক করে বলছি। লি-সিনের রক্তের দাগ মাঝ-রাস্তায় মিলিয়ে যাওয়ার রহস্য, জলের মত সোজা। সেটা বুঝলে আমার অন্তর্ধানও অনায়াসে বুঝতে পারতে। লি-সিন খানিকদূর গিয়ে আবার তাঁবুর দিকে নিজের পথে ফিরে

আসে বলেই তার রক্তের দাগ আর দেখা যায় নি। তোমরা যখন রক্তের দাগের সন্ধানে বাইরে বেরিয়েছ তখন সে তাঁবুর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁবুর পর্দ্দা চিরে ফেলেছে। প্রচুর রক্ত-পাত হয়ে তার অবস্থা তখন বেশ খারাপ।"

আমি নির্ব্বোধের মত তাকিয়ে রইলাম এবার।

মামাবাবু আবার বল্লেন—"আমায় ধরে নিয়ে যাওয়ার রহস্য? আমায় কেউ ধরে নিয়ে যায় নি। তোমরা যখন বাইরে বেরুচ্ছ তখনই আমার জ্ঞান হ'য়েছে। আমার চোট তেমন গুরুতর ছিল না। আমি আর মঙপোই আহত লি-সিনকে নিয়ে পালিয়ে গেছলাম। শুধু লি-সিনকে বাঁচাবার জন্যে নয়, বাইরে থেকে নিজেদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সুবিধা হবে বলে। তোমায় একটু বিপদের মধ্যে ফেলে গেছলাম বটে, কিন্তু আমি জানতাম লাওচেন তোমায় সন্দেহ করে না, আসল কাজ হাসিল হবার আগে পর্য্যন্ত তোমার কোন ক্ষতি করবে না।"

"কিন্তু আসল কাজটা কি!"

"আলেয়া-দারুদের দেশ আবিষ্কার!"

"আলেয়া-দারুরা অদ্ভুত জাত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের আবিষ্কার করবার গৌরব এত বড় যে তার জন্যে এত কাণ্ড এত ষড়যন্ত্র এত খুনোখুনি পর্য্যন্ত দরকার হ'ল?"

মামাবাবু খানিক চুপ করে থেকে আমার দিকে কৌতুক ভরে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বল্লেন, "পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান্ জিনিষ যে তাদের দেশে আশ্চর্য্যরকম প্রচুর, আলেয়া-দারুরা তারই জীবন্ত প্রমাণ!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে মামাবাবুর কাছে ওর বেশী আর কিছু জানতে পারিনি। হার্টজ কেল্লার উদ্দেশ্যে রওনা হবার জন্যেই তখন আমাদের ব্যস্ত হ'তে হয়েছে। আমাদের অনুচরেরা সকলেই বিশ্বাসী। লাওচেনের সঙ্গে তাদের কোন যোগ ছিল না। লাওচেনের নিজের লোক যে ক'জন ছিল তারা আগেই সরে পড়েছে। সুতরাং সে দিক দিয়ে আমাদের কোন হ্যাঙ্গামা হয় নি।

লাওচেন একটা কথা ঠিকই বলেছিল। হার্টজ কেল্লা দিন রাত হাঁটলেও সাতদিনের আগে পৌছান অসম্ভব। জঙ্গলের পাহাড়ের পথে দিন রাত্র হাঁটা সম্ভব নয়; আমরা যাও বা তাড়াতাড়ি করছিলাম, মামাবাবুর কুড়েমিতে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। এত পরিশ্রম করার ক্ষমতা, এত উৎসাহ যাঁর মধ্যে দেখেছি তিনি যেন আরেক লোক হয়ে গেছেন। এরই মধ্যে মনে হচ্ছে যেন মিচিনার বাড়ীতে দুপুরের দিবানিদ্রাটির জন্যে তাঁর প্রাণ আইঢাই করছে। আমাদের কাজ যে কত জরুরি তা তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছেন। আমরা বেশী তাড়া দিলে হেসে

বলেন—“বর্ম্মার সীমান্তের জন্যে ত আর প্রাণটা দিতে পারি নারে বাপু! তাড়াতাড়ি ত যথাসাধ্য করছি।”

এর পর আর কথা চলে না। সাতদিনের জায়গায় দশ দিনে আমরা হার্টজ্. কেল্লায় গিয়ে পৌঁছোলাম। পথের মধ্যে মামা-বাবুর কাছে আমাদের অভিযানের সমস্ত রহস্য অবশ্য আমি পরিষ্কার করে বুঝে নিয়েছিলাম। গোড়া থেকে মায়াবাদুড়রা আমাদের শত্রু, এই ভুল করাতেই যে সমস্ত ব্যাপার দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মায়াবাদুড়রা য়ুনানের একটি গুপ্ত দল। য়ুনানে নানা জাতি আছে, তাদের মধ্যে মুসু শান ও লোলো জাতই প্রধান। এই মুসুরা য়ুনানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এককালে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করত। তারপর তাদের কর্ত্তৃত্ব লোপ পায়। মুসুদের প্রাধান্য ফিরিয়ে আনার জন্যে মায়াবাদুড় দলের সৃষ্টি হয়েছিল অনেক বৎসর আগে। কিন্তু এই দলের নেতা বিশ্বাসঘাতকতা করে বিপক্ষের কাছে দলের লোকেদের ধরিয়ে দেয়। মায়াবাদুড়দের অধিকাংশকেই তার ফলে প্রাণ দিতে হয়। যারা তখন পালিয়ে বেঁচেছিল তারা এখনও প্রতিহিংসার সুযোগ খুঁজে ফিরছে। লি-সিন সেই পলাতক মায়াবাদুড়দেরই একজন। লাওচেন তাদের বিশ্বাসঘাতক সর্দ্দার। লাওচেন একটা কোন গোপন অভিযানে যাবার জন্যে বর্ম্মায় এসেছে সন্ধান পেয়েই লি-সিন তাকে অনুসরণ করে প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প করে। সেই সময়েই মামাবাবুও তাকে

সঙ্গে যাবার জন্যে ডাকেন। মামাবাবুর কাছে সে অনেক উপকারের জন্যে কৃতজ্ঞ, সে ডাক সে উপেক্ষা করতে পারে না। কিন্তু লাওচেন কি রকম ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোক, তার গোপন অভিযানের বাধা যাকে মনে হবে লাওচেন কি রকম পৈশাচিক-ভাবে তার সর্ব্বনাশ করতে পারে, একথা জেনে লি-সিনই মায়া-বাদুড়ের চিহ্ন অঙ্কিত চিঠি দিয়ে মামাবাবুকে তাঁর অভিযান বন্ধ করতে বা একবৎসর পিছিয়ে দিতে বলে। মামাবাবু সে বারণ না শোনাতে বাধ্য হয়ে সে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। যে মায়া-বাদুড়ের উল্কি লি-সিনের হাতে দেখে আমি তার বিরুদ্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলাম, মামাবাবু সেটা দেখেই তখন বুঝেছিলেন, আমাদের শত্রু মায়াবাদুড় নয়, ভয়ঙ্কর অপর কোন পক্ষ। কম্পাস্ প্রভৃতি চুরি যাওয়াতে তাঁর প্রথম সন্দেহ হয় মূল্যবান্ কোন দেশ আবিষ্কারই তাদের উদ্দেশ্য। আমরা খোঁজ পেলেও তার অবস্থান যাতে নির্ণয় করতে না পারি সেই চেষ্টাই তারা প্রথম করেছে। কিন্তু কোথায় সে দেশ, কি তার মূল্য, প্রথমে কিছুই তিনি বুঝতে পারেন নি। লাওচেনের দলের লোক আমাদের ভেতরও আছে জেনে তিনি গোপনে তার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। আমাদের যে অনুচরটি নিহত হয় তার কাছাকাছি যে দুজন অশ্বতর-চালক ছিল, তাদের ওপর তিনি ও লি-সিন দুজনেই নজর রাখেন। ঘটনার সময়ে তারা সাহায্য করতে না আসাতেই তাঁর সন্দেহ হয়। যখন আমি লি-সিনকে

বনের পথে অনুসরণ করি, লি-সিন ও মামাবাবু দুজনেই সে রাত্রে সন্দিগ্ধভাবে ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখে সেই অনুচরেদের একজনের পেছু নেন। লাওচেন তখনই নিজের দলকে অন্যত্র যেতে আদেশ দিয়ে গভীর দুরভিসন্ধি নিয়ে আমাদের সঙ্গে ভিড়বার সঙ্কল্প করেছে। লাওচেনের সেই দলের সন্ধান পেয়েই লি-সিন তাদের কাছাকাছি থেকে তাদের গন্তব্যস্থান ও উদ্দেশ্য জানবার চেষ্টা করে। সেই জন্যেই সে আমাদের তাঁবুতে প্রথমতঃ ফেরেনি। লাওচেন আমাদের তাঁবুতে এসে আশ্রয় নেবার পর তার পক্ষে ফিরে না আসাই সুবিধার হয়। লি-সিনকে একবার দেখতে পেলেই ধূর্ত্ত লাওচেন সাবধান হয়ে যেত, তাছাড়া তার সঙ্গে যে আমাদের যোগ আছে একথা লাওচেনকে লি-সিন জানাতে চায় নি। লাওচেন সুড়ঙ্গপথে লি-সিনের দেখা পাবার পরও সে কথা অনুমান করতে পারে নি। মামাবাবুর লাওচেনকে নিজের দলে নেওয়ার ভেতর গভীর উদ্দেশ্য ছিল। চোরের উপর তিনি বাটপাড়ি করতে চেয়েছিলেন। লাওচেন আমাদের দলে ভিড়েছিল আমাদের উদ্দেশ্য জানবার জন্যে এবং দরকার হলে সহজে পথের কাঁটা নির্ম্মূল করে দেবার জন্যে। মামাবাবু তাকে স্থান দিয়েছিলেন তার অভিযানের আসল রহস্য গোপনে জেনে নেবার জন্যে। লাওচেন আলাদা তাঁবুতে থাকলেও মামাবাবু মঙপোর সাহায্যে তার কাগজপত্র উল্টে জেনেছিলেন, আলেয়া-দারু বলে এক অদ্ভুত জাতের দেশ আবিষ্কার করাই তার

উদ্দেশ্য। প্রথমে ব্যাপারটা তিনি কিছু বুঝতে পারেন নি। তারপর আলেয়াদারুদের হাড়ের ভেতর দিয়ে রাত্রে আশ্চর্য্য আলো বেরোয় জানতে পেরে সমস্ত রহস্য তাঁর কাছে পরিস্কার হয়ে যায়। সেই মুহূর্ত্ত থেকেই লাওচেনের অভিযানের আসল উদ্দেশ্য বুঝে তাকে ব্যর্থ করবার সঙ্কল্প তিনি করেন। মামাবাবু খনিজতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কিন্তু কিছুদিন আগে আমেরিকার একটি আশ্চর্য্য ঘটনার সংবাদ খবরের কাগজে না পড়লে আলেয়াদারুদের ব্যাপার তিনি বোধ হয় বুঝতে পারতেন না। আমেরিকার সেই খবর থেকে সেখানকার একটি ঘড়ির কারখানার কয়েকজন কর্ম্মচারীর আশ্চর্য্য ভাবে মৃত্যুর কথা জানা যায়। সে রোগ আর কিছু নয় দেহের ভেতর রেডিয়ামের ক্রিয়া। ঘড়ির কাঁটা ও ঘণ্টা যাতে অন্ধকারেও দেখা যায় সেই জন্যে রেডিয়াম-মিশ্রিত একটি পদার্থ দিয়ে তাদের ঘড়ির ডালায় দাগ দিতে হ'ত। লেখবার কলম মুখের লালায় ভিজিয়ে তারা কাজ করত। এই ভাবে সামান্য মাত্র রেডিয়াম তাদের উদরে গিয়ে রক্তে সঞ্চারিত হয়। রেডিয়ামের ধর্ম্ম এই যে শরীর থেকে তা বেরিয়ে যায় না, দেহের সমস্ত হাড়ের ওপর গিয়ে জমা হতে থাকে এবং সেখান থেকে প্রচণ্ড শক্তিমান্ জ্যোতিকণা বিকীরণ করে দেহের রক্ত কণিকা নষ্ট করে দেয়। এই কর্ম্মচারীদের দেহেও রেডিয়ামের ক্রিয়া এইভাবে প্রকাশ পায়। রাত্রে অন্ধকারে তারা নিজেদের শরীরের ভেতব থেকে আলো বেরুতে দেখে প্রথম চমকে উঠে।

তারপর ডাক্তারের পরীক্ষায় সমস্ত রহস্য প্রকাশ পায়। আলেয়া-দারুদের দেশে কোন না কোন জলের উৎসে যে রেডিয়াম-লবণের অস্বাভাবিক প্রাচুর্য্য আছে এবং তাদের শরীরের উজ্জ্বল আলো যে সেই রেডিয়াম-লবণেরই পরিচয় একথা বুঝে, সে দেশে এই মূল্যবান্ ধাতুর অত্যন্ত সমৃদ্ধ খনি আবিষ্কারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হন।

লাওচেনের দ্বারা আহত হয়েও সে রাত্রে আমাদের বিমূঢ় করে কি ভাবে তিনি অন্তর্হিত হন তার কথা আগেই বলা হয়েছে। যে তিনজন বৌদ্ধ শ্রমণের কথা শুনেও আমরা তেমন গা করিনি, তারাই মামাবাবু, লি-সিন ও মঙপো। বৌদ্ধ শ্রমণের বেশেই তাঁরা আমাদের আগে আলেয়াদারুদের দেশ সন্ধান করেছেন, এবং সেখানে আমি দারুদের হাতে বিপন্ন হবার পর আমায় রক্ষা করেছেন। দারুদের সেই পূজানুষ্ঠানের রাত্রে আমার হাতের জলের পাত্র ছুড়ে ফেলে না দিলে এতদিনে আমার সেই আলেয়া-দারুদের অবস্থাই হত। আমি পাহাড়ের সুড়ঙ্গ পথে যে আশ্চর্য্য জলের কুণ্ড দেখেছিলাম, রেডিয়ামের সেইটিই প্রধান উৎস। শুধু তার জলে রেডিয়াম লবণ প্রচুর ভাবে মিশ্রিত যে আছে তা নয়, তার গা দিয়ে রেডিয়ামের প্রধান আকর পিচব্লেণ্ডের বড় বড় শিরা জলের তলায় নেমে গেছে। সেখানে লি-সিনের সঙ্গে মামাবাবুও ছিলেন। লি-সিন সে দিন আমায় ডাকবার জন্যেই পিছু নিয়েছিল কিন্তু আমি তাকে ভুল

বুঝেছিলাম। লি-সিনকে এই ভাবে ভুল বোঝার জন্যে মামাবাবুর গোপন আস্তানায় লাওচেনকে নিয়ে গিয়ে আমি নিজেদের কি সর্ব্বনাশ যে করতে বসে ছিলাম ভাবলেও এখন শিউরে উঠতে হয়।

মামাবাবুর কাছে আমাদের অভিযানের সমস্ত রহস্য জেনে কিন্তু আমি আরো হতাশই হয়ে গেলাম। এত কষ্টের পর মামাবাবুর আবিষ্কার এভাবে লাওচেন আত্মসাৎ করে নেবে ভাবলেও যেন মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে। মামাবাবুর কিন্তু সেবিষয়ে কোন উদ্বেগই যেন নেই। সাতদিনের জায়গায় দশদিনে হার্টজ কেল্লায় পৌঁছেও তাঁর বিশেষ কিছু দুর্ভাবনা দেখতে পেলাম না! হার্টজ কেল্লায় আমাদের অবশ্য মামাবাবুর পরিচয় পাবার পর বেশ ভাল রকমই খাতির হ'ল। বেতার-যন্ত্রে বর্ম্মাসরকারের বৈদেশিক মন্ত্রীকে খবর পাঠানর কথা শুনে কিন্তু কেল্লার অধিনায়ক বেঁকে দাঁড়ালেন। এ রকম অদ্ভুত অন্যায় বায়না শুনতে তিনি কিছুতেই পারেন না।

মামাবাবু একটু হেসে বল্লেন—"যদি এই ব্যাপারের ওপর বর্ম্মা, চীন ও য়ুনানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, তবুও না?"

লেফটেনাণ্ট ব্লাইদ গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"আপনার কথার মানে বুঝতে পারছি না।"

মামাবাবু আধঘণ্টা ধরে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে দেবার পর কিন্তু লেফটেনাণ্ট ব্লাইদ ভয়ঙ্কর রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন দেখা গেল।

"এর মানে যুদ্ধ, বুঝতে পারছেন মিঃ সেন ? ফাঁকি দিয়ে এভাবে নিজের সুবিধামত সীমান্ত নির্দ্দেশ করে নিলে যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী !"

মামাবাবু হেসে বল্লেন—"সেইটেই ত নিবারণ করতে চাই !"

এর পর বেতারে খবর পাঠান সম্বন্ধে কোন অসুবিধা আর হ'ল না। মামাবাবু সীমান্ত-নির্দ্দেশের মূল অফিসে বৈদেশিক মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করে পাঠালেন—"য়ুনানের সঙ্গে বর্ম্মার সীমান্ত-নির্ণয় শেষ হয়ে গেছে কি না ?"

তখন আমরা সকলে সেখানে সমবেত হয়ে উদ্বিগ্ন চিত্তে উত্তরের প্রতীক্ষা করছি।

উত্তর আসতেও বিশেষ বিলম্ব হ'ল না। সে উত্তরে বুক কিন্তু একেবারে দমে যাবারই কথা। বৈদেশিক মন্ত্রী জানিয়েছেন যে সীমান্ত নির্ণয়ের কাজ একেবারে সম্পূর্ণ। য়ূনান সরকার শেষ মুহূর্ত্তে সামান্য অদল বদল করবার প্রস্তাব করে একটু গোল বাধিয়ে ছিলেন, তবে তাঁদের সে অনুরোধও শেষ পর্য্যন্ত রাখা হয়েছে।

লেফটেনাণ্ট ব্লাইদ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন—"বর্ম্মা এ ফাঁকি কিছুতেই সইবে না। একটা যুদ্ধ আসন্ন, আমি আপনাকে জানাচ্ছি।"

মামাবাবু হেসে বল্লেন—"না লেফটেনাণ্ট ব্লাইদ যুদ্ধের আর দরকার হবে না। ফাঁকি বর্ম্মা পড়ে নি।"

আমরা সমস্বরে বল্লাম—"তার মানে ?"

"তার মানে, আমার নোট বই পরিণামে শত্রুর হাতেই পাছে যায় এই ভয়ে আমি লঙ্গিচিউড ল্যাটিচিউডের ঠিক হিসাব তাতে টুকে রাখিনি। ইচ্ছে করে কিছু ভুল রেখেছিলাম। য়ূনান সেই ভুল হিসাব ধরে সীমান্ত নির্ণয় করে নিজেই ঠকেছে।